বিপ্লবের ভেতর-বাহির

শওকত মাসুম

আমরাবন্ধু.কম

“ সিরাজ সিকদার সাচ্চা বিপ্লবী ছিলেন। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব আর নকশালবাড়ি আন্দোলনের ঢেউ এখানেও এসে লেগেছিল। সিরাজ সিকদার মুক্তিযুদ্ধেও অংশ নেন। সিরাজ সিকদাররা সত্যিকার শোষনমুক্ত একটা দেশ চেয়েছিলেন। তিনি পারতেন স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে। কিন্তু মানুষকে ভালবেসে সেটা করেননি। তবে সেই বিপ্লব সফল হয়নি। ব্যর্থতার নানা কারণ ছিল। এই লেখা সিরাজ সিকদারের মূল্যায়ন নয়। সফলতা বা ব্যর্থতারও কাহিনী নয়। বরং তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন বই ও লেখা পড়ে সেই সময়কার নানা ঘটনার কিছু দিক নিয়ে আলোচনা বলা যায়। ”

– শওকত মাসুম

‘আমরাবন্ধু.কম’ এ ‘শওকত মাসুম’ এর লেখা ছয় পর্বের ধারাবাহিকের সংকলন।

বিপ্লবের ভেতর-বাহির ১

১৯৭২ সালের একদিন। ডিঙ্গি নৌকায় করে কামরাঙ্গির চরের পাশ দিয়ে বুড়িগঙ্গা পাড় হয়ে তারপর যেতে হয় জিঞ্জিরায়। সেখানেই ছোট্ট একটা বাড়ি। এই পার্টির নিজস্ব গোপন শেল্টার। এই শেল্টারে থাকেন চার জন। কমরেড আসাদ, কমরেড মুক্তা, কমরেড শিখা এবং কমরেড টিটো। ভুল হলো, আরো এক সদস্য আছে। সাত-আট মাসের এক শিশু, নাম বাবু। কমরেড মুক্তার ছেলে। সেও জন্মগত ভাবে বিপ্লবী কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। এই পাঁচ জনের সঙ্গে থাকতে চলে এলেন কমরেড আরিফ, তাঁর স্ত্রী রানু এবং দেড় বছরের পুত্র শান্তনু। বিপ্লব করতে এরাও ঘর ছেড়ে গোপন আস্তানায় চলে এসেছেন। কমরেড টিটু তাদের নিয়ে এলো এই শেল্টারে।

ওরা সবাই পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির সদস্য। তাদের নেতা সিরাজ সিকদার। সশস্ত্র বিপ্লব তাদের লক্ষ্য, স্বপ্ন শোষানমুক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠা। সেই ইতিহাস কমবেশি অনেকেই জানেন। তবে আমাদের আজকের গল্পটি কমরেড মুক্তার। বলে রাখা ভাল, সবগুলোই রাজনৈতিক নাম, ছদ্মনাম। আসল পরিচয় গোপন রাখা পার্টির নির্দেশ। কর্মীদের ব্যক্তিগত পরিচয় জানার বিষয়টিও ছিল পার্টির সাংগঠনিক শৃঙ্খলাবহির্ভূত। কমরেড মুক্তা সবাইকে দাদা বলে ডাকতো। মুক্তার স্বামী কমরেড ঝিনুক। কমরেড ঝিনুক ঢাকায় থাকে না, খুলনা অঞ্চলে পার্টির কাজ করে। ঝিনুকের সঙ্গে তখন পার্টির মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব চলছিল। এ কারণে ঢাকায় আসতো পারতো না সে। ফলে স্ত্রী ও সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকতে হতো কমরেড ঝিনুককে। মনে রাখতে হবে, 'ব্যক্তিস্বার্থ এমনকি ব্যক্তিগত সুখ-দু:খও বিপ্লবের অধীন'-এটি বিপ্লবের আরেকটি তত্ত্ব। তারপরেও শেল্টারে কমরেড মুক্তা সর্বদা থাকতো মনমরা হয়ে।

কমরেড মাসুদ এসে একদিন জানালেন, বিশেষ সাংগঠনিক শৃঙ্খলাজনিত কারনে মুক্তাকে কয়েকদিনের জন্য অন্য শেল্টারে সরিয়ে নিতে হবে। নতুন সেই শেল্টারটি ঢাকার আগামসি লেনে অবস্থিত। মুক্তাকে নতুন শেল্টারে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পড়লো আরিফের উপর। তিনি পৌঁছেও দিলেন।

সিরাজ সিকদার ঢাকায় এলে জিঞ্জিরার এই শেল্টারেও উঠতেন। কমরেড আরিফ কমরেড মুক্তাকে নতুন শেল্টারে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে দেখলেন সিরাজ সিকদার তাঁর মিসেস জাহানারা হাকিমকে নিয়ে চলে এসেছেন। সঙ্গে দুই সন্তান শিখা ও শুভ্র।

এবার আমাদের একটু পেছনে যেতে হবে। সিরাজুল হক সিকদার ছিলেন বুয়েটের ছাত্র। ছিলেন লিয়াকত আলী হল ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন গ্রুপ) সভাপতি। তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতিও হয়েছিলেন। বুয়েট থেকে তিনি পাশ করেন ১৯৬৭ সালে। চীনের রেড গার্ড মুভমেন্টে অনুপ্রাণিত হয়ে কৃষকদের নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন সিরাজ সিকদার। কৃষকদের সংগঠিত করতে চলে যান নিজের গ্রাম ফরিদপুরের ডামুড্যায়। সিরাজ সিকদার ছিলেন সুদর্শন। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পড়তেন। সানগ্লাস তাঁর প্রিয় ছিল। বেশভুষায় আধুনিক। ফলে তাঁর পক্ষে কৃষকদের বিশ্বাস অর্জন করা শুরুতে কঠিন ছিল। সম্ভবত আস্থা অর্জনের জন্যই সিরাজ সিকদার দ্রুত একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। হটকারিও বলা যায়। আর সেটি হল, হঠাৎ করে তিনি এক দরিদ্র কৃষকের মেয়ে রওশন আরাকে বিয়ে করেন। আর এই রওশন আরাই আমাদের কমরেড মুক্তা। পরে প্রমান হয়েছে সিরাজ সিকদারের এই সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। এ জন্য একাধিক জীবন নষ্ট হয়েছে। বিপ্লবেরও ক্ষতি হয়েছিল যথেষ্ট।

সিরাজ আর রওশন আরার দুই সন্তান। বড় মেয়ে শিখা আর ছেলে শুভ্র। এই শিখা আর শুভ্রর মা আমাদের কমরেড মুক্তা। এই বিয়ে টেকেনি। ১৯৭২ সালে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। তখন সিরাজ সিকদার পুরোপুরি গোপন রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। গঠন করেছেন পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি।
সিরাজ সিকদার মারা যাওয়ার পর দলের সম্পাদক হয়েছিলেন রইসউদ্দিন আরিফ। তিনি লিখেছেন, এই বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তটি এককভাবে সিরাজ সিকদারের ছিল না। পার্টি নেতার 'নিরাপত্তা' ও 'স্ট্যাটাসের' কথা ভেবে এটি ছিল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত। দলের বিভিন্ন ইশতেহার পড়লেও এর সত্যতা পাওয়া যায়। একাধিক ইশতেহারে বলা আছে, সিরাজ সিকদার যে জীবন যাপন করেন তা পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারেই। তবে এই বিবাহবিচ্ছেদটি যে পার্টি ও বিপ্লবের জন্য কল্যানকর হয়নি তা পরবর্তী বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রমানিত হয়েছে-লিখেছেন রইসউদ্দিন আরিফ।
তবে খটকা লাগে 'স্ট্যাটাস' কথাটার কারণে। প্রলেতারিয়েতদের জন্য কাজ করেছেন সিরাজ সিকদার। যদি তাই হয়, তাহলে একজন দরিদ্র কৃষকের মেয়ের সঙ্গে জীবন যাপন নিয়ে কেন স্ট্যাটাসের প্রশ্ন উঠবে। এর উত্তর পাওয়া যাবে না। কারণ, এ নিয়ে কেউই খুব বেশি কিছু লেখেননি। অল্প কিছু জানা যায় সিরাজ সিকদারের একসময়ে সহযোগি সূর্য রোকনের একটা লেখা থেকে। কমরেড মুক্তা এখন কোথায় আছে জানা নেই। জানা নেই শিখা আর শুভ্র কোথায় আছে তাও।
কমরেড মুক্তার কাহিনী আরও আছে। 'পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্তটি কমরেড মুক্তা মাথা পেতে মেনে নিয়েছিলেন, প্রথমত, পার্টি ও বিপ্লবের স্বার্থে, দ্বিতীয়ত, নিজের শ্রেনী অবস্থানের কথা বিবেচনা করে। কমরেড মুক্তার দ্বিতীয়বার বিয়ে হয়েছিল কমরেড ঝিনুকের সাথে। কমরেড সিরাজ সিকদার নিজেই এ বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন' (আন্ডারগ্রাউন্ড জীবন সমগ্র-রইসউদ্দিন আরিফ)। আবারও খটকা লাগে 'শ্রেণী অবস্থানের' কথায়।
সিরাজ সিকদার সিকদার জিঞ্জিরার শেল্টারে আসলেই এখান থেকে অন্য শেল্টারে নিয়ে যাওয়া হতো মুক্তাকে। দেখা হতো না শিখা ও শুভ্রর সঙ্গে। কারণ বলা হত 'নিরাপত্তা' ও 'শৃঙ্খলাজনিত কারণ'। না কি প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে যাতে দেখা না হয় সে কারণেই জিঞ্জিরা শেল্টার থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল মুক্তাকে।
কমরেড মুক্তার কাহিনী কিন্তু এখানেই শেষ নয়। তার জীবনের ট্রাজেডি আরও আছে। সিরাজ সিকদার সরকারি বাহিনীর হাতে মারা যাওয়ার পর দীর্ঘ সময় ধরে দলের মধ্যে নানা ধরণের দ্বন্দ্ব দেখা যায়। খুনোখুনি হয় নিজেদের মধ্যে। এতে মারা যায় দলের অধিকাংশ কেন্দ্রীয় নেতা। এক দল আরেক দলকে খতম করে। মতের মিল না হওয়ায়, সামান্য সন্দেহে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয় দলের সদস্যদের। খতম করা হয় অনেককেই। আর এই পথেই খতম করা হয় কমরেড ঝিনুককে। এর পরে মুক্তার জীবনে কি হয়েছে তার কোনো হদিস পাওয়া গেল না।
আগেই বলা হয়েছে, সিরাজ সিকদার ও রওশন আরার বিবাহবিচ্ছেদটি পার্টি ও বিপ্লবের জন্য কল্যাণকর হয়নি। এর অনেক প্রমান পরবর্তীতে দেখা যায়। সে ঘটনায় যাওয়ার আগে আমাদের জানতে হবে সিরাজ সিকদারের দ্বিতীয় বিয়ের কাহিনী। এ কাহিনীও অভিনব, ঘটনাবহুল ও রোমাঞ্চকর। উপন্যাসকেও হার মানায় সে কাহিনী।
সেই কাহিনী পরের পর্বে।

নোট: সিরাজ সিকদার সাচ্চা বিপ্লবী ছিলেন। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব আর নকশালবাড়ি আন্দোলনের ঢেউ এখানেও এসে লেগেছিল। সিরাজ সিকদার মুক্তিযুদ্ধেও অংশ নেন। সিরাজ সিকদাররা সত্যিকার শোষনমুক্ত একটা দেশ চেয়েছিলেন। তিনি পারতেন স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে। কিন্তু মানুষকে ভালবেসে সেটা করেননি। তবে সেই বিপ্লব সফল হয়নি। ব্যর্থতার নানা কারণ ছিল। এই লেখা সিরাজ সিকদারের মূল্যায়ন নয়। সফলতা বা ব্যর্থতারও কাহিনী নয়। বরং তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন বই ও লেখা পড়ে সেই সময়কার নানা ঘটনার কিছু দিক নিয়ে আলোচনা বলা যায়। কারণ, আমার ধারণা, বিপ্লবীরা ব্যক্তি মানুষকে গুরুত্ব কম দিয়েছে। কিন্তু একটা মানুষের নানা দিক আছে। সেগুলো বিবেচনা করা হলে বিপ্লবের ইতিহাস হয়তো অন্যরকম হতো।

সিরাজ সিকদার নিয়ে লেখালেখি অনেক আছে। আগ্রহীরা মূল্যায়ন জানতে চাইলে সেগুলো পড়তে পারেন।

বিপ্লবের ভেতর-বাহির: ২

এবারের পর্ব রুহুল আর রাহেলাকে নিয়ে। দুজনেই বিবাহিত। রুহুল একজন প্রকৌশলী, কিন্তু চাকরিতে মন নেই। রাজনীতিতে মগ্ন, তাও আবার প্রথাগত রাজনীতিতে নয়। সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য তৈরি হচ্ছেন। পিকিং-এর গরম হাওয়া তার শরীর আর মন জুরে। স্ত্রী আছে, সন্তানও আছে।

রাহেলার জীবন একদমই অন্য রকম, অন্য মেরুর। রাহেলারও দুই সন্তান। রাহেলার স্বামী সামরিক বাহিনীতে কর্মরত, নাম বিগ্রেডিয়ার হাকিম। পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা বা এনএসআইর মহাপরিচালক।

রাহলারও এই জীবন পছন্দের নয়। রাহেলার লেখালেখিতে আগ্রহ। বেগম পত্রিকায় লেখেন। প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার মানুষ। কিন্তু রাহেলার এসব চিন্তা বা কাজে সমর্থন নেই স্বামীর। ফলে এক প্রকার গৃহবন্দী রাহেলা। এক পর্যায়ে বাইরে যাওয়াই নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

রাহেলার আসল নাম জাহানারা হাকিম। তাঁর মামাতো বা খালাতো ভাই রোকন। তাঁর আরেক নাম সূর্য রোকন। মালিবাগে তখন তৈরি হয়েছে মাওসেতুং চিন্তাধারা গবেষণাগার। এই কেন্দ্রের সঙ্গে কাজ করেন তিনি। রোকনের সাহায্যে বাসা থেকে পালালেন জাহানারা। সময়টা ১৯৬৯ সাল। সেই সময়ে জাহানারার সঙ্গে দেখা হল রুহুলের। এই দেখা হওয়াটার একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে। ভবিষ্যতের অনেক ঘটনার পেছনে এই রুহুল আর রাহেলার দেখা হওয়াটার একটি প্রতিক্রিয়া আমরা পরে দেখতে পাবো।

এবার রুহুলের প্রকৃত নাম বলি। আমাদের এই রুহুলই সিরাজ সিকদার। সিরাজ সিকদার আর জাহানারা পরস্পরকে পছন্দ করলেন, ভালবাসলেন। এবং উত্তপ্ত সেই সময়ে এক সঙ্গে থাকাও শুরু করলেন, এখনকার ভাষায় লিভ টুগেদার। জাহানারা নাম পালটে হলেন খালেদা। এনএসআই তখন হন্যে হয়ে খুঁজছে জাহানারাকে। একপর্যায়ে জেনে গেলো খালেদাই এখন জাহানারা। আবার নাম পালটাতে হল। খালেদা এবার হলেন রাহেলা। মজার ব্যাপার হলো, তখন সিরাজ সিকদারও নতুন একটি নাম নিয়েছিলেন। সেই নামটি ছিল হাকিম ভাই। বলে রাখি, সিরাজ সিকদার পরে যখন পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি গঠন করেন, তখন রাহেলার নাম হয়ে যায় জাহান, কমরেড জাহান।

হুট করে এর আগে দরিদ্র কৃষকের মেয়ে রওশন আরাকে বিয়ে করেছিলেন সিরাজ সিকদার। সেই সম্পর্ক কখনোই মধুর ছিল না। দুজনের শিক্ষা-দিক্ষা ও শ্রেনীগত পার্থক্যের কারণে সম্পর্কটি শেষপর্যন্ত টেকেনি। কিন্তু জাহানারা কবিতা লিখতেন। নারীবাদি চিন্তাভাবনা ছিল। ফলে দুজনের মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক তৈরি হতে সময় নেয়নি। সিরাজ সিকদার ও জাহানারা মিলে পরবর্তীতে লেখালেখি করেছেন, বিপ্লবের কবিতাও লিখেছিলেন।

এনএসআই তখন দুজনকেই খুঁজছে। এ কারণে রুহুল ও রাহেলাকে বার বার শেল্টার পালটাতে হয়েছিল। সূর্য রোকন লিখেছেন, সিরাজ সিকদার তখন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছেন। এনএসআই সিরাজ সিকদারকে না পেয়ে শ্রমিক আন্দোলনের সদস্যদের ধরে কাফকা মামলায় জেলে দিয়েছিল। কাফকা মামলা হল, পরের বউকে অপহরনের অভিযোগ।

এনএসআই শেষ পর্যন্ত আর সফল হয়নি রুহুল ও রাহেলাকে গ্রেপ্তার করতে। এর মধ্যে বিগ্রেডিয়ার হাকিম আবার বিয়েও করেন। সব চেয়ে বড় কথা হল, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পুরো ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

সিরাজ সিকদার বরিশালের পেয়ারা বাগানে নতুন দল করেন। সেই গোপন বিপ্লবী দলে যোগ দেন জাহানারা হাকিম। পুরোটা সময় ছায়ার মতো তিনি ছিলেন সিরাজ সিকদারের সঙ্গে। পরে তারা দলের অনুমোদন নিয়ে বিয়ে করেন, তাদের একটি ছেলেও হয়।

সিরাজ সিকদারের একসময়ের সহযোগি সূর্য রোকন লিখেছেন মজার একটি তথ্য। ১৯৭৩ সালে সিরাজ সিকদার আর্মির হাতে মাদারিপুরে একবার ধরা পরেছিলেন। কিন্তু সেসময়ের বঙ্গবন্ধু সরকারের উপর বিতশ্রদ্ধ আর্মির কমান্ডার মহসিন তাদের ছেড়ে দেন। এরপর দুজন পার্বত্য চট্টগ্রামে চলে যান।

দিনটি ছিল ১৯৭৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর। ওই তিন তিনি চট্টগ্রামে ধরা পড়েন পুলিশের হাতে। আর সাভারে সিরাজ সিকদার খুন হন ১৯৭৫ সালের ১ জানুয়ারি। (কেউ বলেন শেরে বাংলা নগরে। বাংলাদেশে এটাই প্রথম ক্রসফায়ারের ঘটনা। সেই একই গল্প। পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় বাধ্য হয়ে পুলিশের গুলি)। এরপর জাহানারাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কুমিল্লায় তাঁর ভাইয়ের কাছে। আর তাদের একমাত্র সন্তান অরুণকে দেওয়া হয় সিরাজ সিকদারের বাবার কাছে, ঢাকায়।

আগেই বলেছি, সিরাজ ও জাহানারার বিয়ের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল দলটির মধ্যে। দলের মধ্যে প্রথম বিরোধ তৈরি হয় এই বিয়ে নিয়েই। এই বিরোধের ফল হয়েছিল মারাত্বক। দলের মধ্যে খুনোখুনির ঘটনা ঘটে। সম্ভবত, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির নিজেদের মধ্যে প্রথম খতমের ঘটনা ঘটে এই বিয়েকে কেন্দ্র করেই, পার্টির সিদ্ধান্তে। সেই ঘটনায়ও জড়িয়ে আছে আরেক প্রেম কাহিনী। সেই ঘটনা পরের পর্বে

নোট: পিয়াল সিরাজ সিকদার নিয়ে একটি সিরিজ করেছিল সামুতে। সিরাজ সিকদার নিয়ে পড়তে গিয়ে সেই সিরিজের সূত্রে পেয়ে যাই সূর্য রোকনের ছোট্ট লেখাটি। সিরাজ সিকদার নিয়ে জানতে পিয়ালের সিরিজটিও পড়তে পারেন। আর এই পর্বের অনেক কিছুই পাওয়া যাবে পিয়ালের সিরিজে।

বিপ্লবের ভেতর-বাহির: ৩

সকলেই জানি যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাম দলগুলোর ভূমিকা ছিল খুবই জটিল ও বিভ্রান্তিকর। মস্কোপন্থীরা এই বিভ্রান্তি থেকে দূরে ছিল। তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। কিন্তু চীনপন্থীরা এই বিভ্রান্তি থেকে বের হতে পারেনি। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মা-লে) যুদ্ধ শুরু হলে দুই ভাগ হয়ে যায়। এর মধ্যে এক ভাগ মুক্তিযুদ্ধকে বলেছিল, 'দুই কুকুরের লড়াই'। মূলত মতিন-আলাউদ্দিন ও আব্দুল হক-তোহায়ার নেতৃত্বের দলগুলো মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীরা করে। এর মধ্যে হক-তোহায়া পাকিস্তান বাহিনীর সহযোগিতায় মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়াইও করেছিল। এমনকি তারা পাক সেনাদের কাছে অস্ত্র পেয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আবার সুখেন্দু দস্তিদার লাল ফৌজ বাহিনী গঠন করে পাক সেনা ও মুক্তিবাহিনী উভয়ের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করে। একই ধরণের কাজ করেছিল মতিন-আলাউদ্দিন গ্রুপ। যদিও একাত্তরের ঘাতক-দালাল বলার সময় এইসব চীনাপন্থীদের কথা আমরা কখনোই মনে করিনা।

চীনপন্থীদের মধ্যে ব্যক্তিক্রমও কিছু আছে। এর মধ্যে দেবেন সিকদার ও আবুল বাশার গ্রুপের কথা বলা যায়। এই গ্রুপের ওহিদুর রহমান আত্রাই এলাকায় অস্ত্র লুট করে এক বড় কৃষক গেরিলা বাহিনী গঠন করে যুদ্ধ করেছিল। শুরুতে এই দলটি খতম লাইনে থাকলেও পরে পাক সেনাদেরই মূল প্রতিপক্ষ হিসেবে বেছে নেয়।

তবে উজ্জল ব্যতিক্রম ছিলেন সিরাজ সিকদার। শুরু থেকেই মূল শত্রু চিহ্নিত করতে সময় নেননি তিনি। তাঁর নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলণ ভিন্নমূখী এক রাজনেতিক বক্তব্য নিয়ে বাংলাদেশের যুদ্ধবিক্ষুব্ধ রণাঙ্গণে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৭১ সালের ৩ জুন বরিশালের স্বরূপকাঠির পেয়ারাবগানে অনুষ্ঠিত এক গোপন সম্মেলনে সিরাজ সিকদার পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন বিলুপ্ত করে গঠন করেছিলেন পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি। টাঙ্গাইল, বরিশাল, মাদারীপুর, গৌরনদী ও মঠবাড়িয়া অঞ্চলে এই দলটি সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেয়।

সেই সময়ে সিরাজ সিকদারের দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন ফজলু। ফজলুর প্রকৃত নাম ছিল সেলিম শাহ নেওয়াজ। বরিশালের কলেজ ছাত্র ছিলেন, বাড়ি বরিশালেরই কাকচিরা গ্রাম। ফজলু ছিলেন বরিশাল-খুলনা এরিয়ার কমান্ডার, সর্বহারা পার্টির নির্বাহী কমিটির ৭ নং সদস্য। দলের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন ফজলু।

১৯৭২ সালের ১৪ জানুয়ারি পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসের পরপরই দলের মধ্যে নেতৃত্ব, রণকৌশল ইত্যাদি নিয়ে মতভেদ দেখা দেয় এবং উপদলের সৃষ্টি হয়। পার্টিতে প্রথম উপদল সৃষ্টি করেন সাদেক, বেবী, আবুল হাসান ও শান্তিলাল। কিন্তু এই চক্রটি খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারেনি। অস্তিত্বও টিকিয়ে রাখতে পারেনি। দ্বিতীয় উপদলটি গঠন করেছিলেন এই ফজলু বা সেলিম শাহনেওয়াজ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরেক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য সুলতান।

ফজলু-সুলতান ছিলেন প্রথম কংগ্রেসে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য।

'পার্টির লাইন সঠিক, তবে সিরাজ সিকদার প্রতিক্রিয়াশীল' - এই ছিল তাদের শ্লোগান।

এই শ্লোগান দিয়ে দলে আন্তঃপার্টি সংগ্রামের চেষ্টা চালায় তারা। সিরাজ সিকদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দেওয়া হয়। ফজলু-সুলতানকে অভিযুক্ত করা হয় খুলনা এলাকায় উপদল গঠন, পার্টি কর্মী হত্যা ও সিরাজ

সিকদারকে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টার ষড়যন্ত্রে। ১৯৭২ এর এপ্রিলে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ফজলু (প্রকৃত নাম- সেলিম শাহনেওয়াহজ), সুলতান (মাহবুব), জাফর (আজম) ও হামিদকে (মোহসিন) পার্টি থেকে বহিস্কার করে। জুলাই মাসে একই অভিযোগে বহিস্কার করা হয় ইলিয়াস, রিজভী, সালমা, মিনু ও মনসুরকে। এই মিনু নামটি বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে।
ফজলু-সুলতানের বিদ্রোহ সর্বহারা পার্টিকে বড় ধরণের ঝাকুনি যে দিয়েছিল তার প্রমান পাওয়া যায় পার্টির ১৯৭২ সালের দলিলে। প্রথম ৩০ এপ্রিল একটি জরুরী সার্কুলার জারি করা হয়। পুরো সার্কুলারটিই ছিল ফজলু-সুলতানকে নিয়ে। এরপর ধারাবাহিকভাবে একের পর এক বিশেষ সার্কুলার জারি করে পার্টি। সবগুলোরে বিষয়বস্তুই ফজলু-সুলতান। আরও অনেক অভিযোগের সঙ্গে দুই হাজার টাকা চুরিও অভিযোগ আনা হয়। সার্কুলার অনুযায়ী, অভিযোগগুলো ছিল, ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত করা, গুজব-অপবাদ রটনা করা, গুপ্ত হত্যার পরিকল্পনা করা, অর্থ-অস্ত্র চুরি করা, পার্টির শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা, কু-দেতা ঘটিয়ে পার্টির ক্ষমতা দখল করা ইত্যাদি।
১৯৭২ সালের ৩ জুন ছিল সর্বহারা পার্টির প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবস। এই দিন বরিশালে হত্যা করা হয় ফজলুকে। ১৯৭২ সালের ১০ জুন এক বিশেষ ইশহেতারে এই খতমের ঘোষণা দেওয়া হয়। সেখানে বলা হয়, *‘পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির বীর গেরিলারা নিজস্ব উদ্যোগে ৩রা জুন ফজলু চক্রকে দেশীয় অস্ত্রের সাহায্যে খতম করে।’* বিশেষ সেই ইশতেহারের শিরোনাম ছিল, *‘পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির বীর গেরিলারা এই বিশ্বাসঘাতক চক্রকে খতম করে সর্বহারা পার্টির প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করেছে।’*। সফলভাবে ফজলুকে হত্যার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি পরে বরিশাল অঞ্চলের গেরিলাদের কাস্তে হাতুড়ি খচিত স্বর্ণপদক প্রদান করে।

কেন ফজলু (তাঁর আরেকটি নাম ছিল আহাদ) সিরাজ সিকদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো? এমনিতেই সিরাজ সিকদার নিয়ে লেখালেখির পরিমাণ খুব বেশি না। তবে যত লেখাই হয়েছে ফজলু অধ্যায়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তবে ফজলুর বিদ্রোহের কারণ নিয়ে খুব বেশি বিশ্লেষন হয়নি। তবে সিরাজ সিকদারের এক সময়ের সহযোগি সূর্য রোকনের লেখায় কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। এই বিদ্রোহের পেছনেও রয়েছে প্রেম। আমরা আগের পর্বে রুহুল (সিরাজ সিকদার) আর রাহেলার (জাহানারা হাকিম) প্রেম, এক সঙ্গে থাকা, মেলামেশা ও পরে বিয়ে নিয়ে আলোচনা করেছি। তাদের এই সম্পর্ক নিয়ে কানাঘুষা ছিল পার্টির মধ্যেও। কেউ কেউ এই সম্পর্ক মানতে পারেননি। তবে সমস্যা শুরু হয় যখন ফজলু বা সেলিম শাহনেওয়াজ তাঁর দীর্ঘদিনের প্রেমিকাকে বিয়ে করতে চাইল এবং কেন্দ্রীয় কমিটি তা মানলো না। বলা হল মেয়েটি প্রকৃত বিপ্লবী না, পেটি বুর্জোয়া।
প্রশ্ন হচ্ছে সিরাজ সিকদারের নতুন সম্পর্ক মেনে না নেওয়ার এই অভিযোগ কতটা সত্য। এই অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায় সর্বহারা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটি বিবৃতি থেকে। ফজলু-সুলতান *‘পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির বিপ্লবী কমরেড ও সহানুভূতিশীল, সিরাজ সিকদারের কাছ থেকে জবাব নিন’* শিরোনামে একটি পুস্তিকা বের করেছিল। এর একটি জবাব হিসাবে ৭২ এর জুনে বিবৃতিটি দেয় কেন্দ্রীয় কমিটি। এর এক জায়গায় বলা হয়েছে, *কমরেড সিরাজ সিকদার যে ধরণের জীবনযাপন করেন তা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কমরেডদের অধিকাংশের ইচ্ছ মতই করেন।* আরেক জায়গায় বলা আছে, *কমরেড সিরাজ*

সিকদারের ব্যক্তিগত জীবন সংক্রান্ত বিষয়াদি পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত। একজন সর্বহারা বিপ্লবী হিসাবে তিনি কখনও পার্টির নিকট মিথ্যা বলেননি। পার্টির অনুমতিসহ বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার কমরেডদের আছে।

এবার আসা যাক ফজলুর প্রেম ও বিয়ে প্রসঙ্গ। সম্ভবত এটিই ছিল বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। এর স্বপক্ষে বড় প্রমান হচ্ছে **১৯৭২** সালে প্রকাশিত আরেকটি পার্টি দলিল। হুবহু তুলে দেওয়া যেতে পারে কথাগুলো।

ফজলু-সুলতান চক্র বলত যৌনকে কি অস্বীকার করা যায়? অর্থাৎ অপরিবর্তিত ক্ষুদে বুর্জোয়া মেয়ের সাথে প্রেমকে যৌন কারণে বাদ দেওয়া যায় না। যৌন কারণে তাকে নিয়ে বিয়ে করতে হবে। অর্থাৎ বিপ্লব, পার্টি ও জনগনের ক্ষতি হবে জেনেও শুধু যৌন কারণে অপরিবর্তিত বুদ্ধিজীবী মেয়েদের বিয়ে করা, যৌনের কাছে আত্মসমর্পন করা। ইহা হল যৌন স্বার্থের নিকট বিপ্লব, জনগন ও পার্টি স্বার্থকে অধীন করা।

ফজলু পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনে যোগদানের কিছুদিন পরে পাশ করলেই বিয়ে করা যাবে, এ কারণে সুবিধাবাদী হয়ে পরীক্ষা দেয়, ক্ষুদে বুর্জোয়াসুলভ পত্র লেখে, জেলে প্রেমিকার চিন্তায় বিভোর থাকে, জেল থেকে বেরিয়ে পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের চরম নির্যাতনের সময় বিয়ের কাজে প্রাধান্য দেয়, ব্যক্তিস্বার্থে প্রেমিকাকে নিয়ে আসে, ফ্রন্টের দায়িত্ব ভুলে যেয়ে প্রেমিকার নিরাপত্তার জন্য নিজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে বাড়ীতে যায়, সেখানে প্রেমিকার জন্য ফ্রন্টের দায়িত্ব ভুলে থেকে যায়, অর্থ-অস্ত্র হারায়, পরে পার্টি তাকে কাজ দিলে সেখানে প্রেমিকার চিন্তায় কাজে অমনোযোগ প্রদর্শন করে, শেষ পর্যন্ত উক্ত দায়িত্ব থেকে অপসারণ চায়, প্রেমিকাকে নিয়ে আকাশ-কুসুম কল্পনা করে, শেষ পর্যন্ত প্রেমিকার চিন্তায় আত্মহত্যা করতে পদক্ষেপ নেয়, মানসিক বিকার জন্মায়, প্রেমিকার অভিযোগে পার্টির প্রতি অসন্তুষ্ট হয়।

এভাবে ফজলু-সুলতান চক্র যৌনস্বার্থের নিকট বিপ্লব ও জনগনের স্বার্থকে অধীন করে। এর পরিণতি কি? এর পরিণতি হলো ফজলু-সুলতান চক্র গঠন, ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত চালানো, পার্টির অর্থ চুরি, শেষ পর্যন্ত পার্টি, বিপ্লব, জনগনের স্বার্থের ক্ষতি করা।

ফজলুর সেই প্রেমিকার নাম ছিল মিনু। মিনুকেও বহিস্কার করা হয়েছিল সে সময়ে পার্টি থেকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ফজলুর সেই বিদ্রোহের অন্যকম কারণ প্রেম-বিয়ে। আর এ কারণে ফজলু-সুলতান চক্রের প্রায় সবাইকে জীবন দিতে হয়েছিল নিজে দলের কর্মীদের হাতেই। নিষ্ঠুর ভাবে খতম করা হয়েছিল তাকে।

রইসউদ্দিন আরিফ লিখেছেন, *পার্টিতে বাহাত্তর সালে ফজলু খতম হয়েছিল আকস্মিকভাবে। পার্টির স্থানীয় কর্মী ও গেরিলারা কেন্দ্রের অনুমোদন ছাড়াই ফজলুকে খতম করেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটি পরে ফজলু খতমের বিষয়টিকে অনুমোদন করে এবং এহেন কাজকে অভিনন্দিত করে। অথচ আমার মতে সে সময়ে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সঠিক করণীয়টি ছিল একদিকে ফজলু-সুলতান চক্রের পার্টিবিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রাম জোরদার করা এবং একই সাথে ফজলু খতমের ঘটনাকে নিন্দা করা। পার্টি যদি সেদিন এই ঐতিহাসিক দায়িত্বটি পালনে সক্ষম হতো, তাহলে সর্বহারা পার্টির ইতিহাস লিখিত হতো ভিন্নভাবে।*

আসলেই অন্যরকম লেখা হত পার্টির ইতিহাস। কেননা, ফজলুর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই অধ্যায়ের শেষ

হয়নি। এই বিদ্রোহ আর খতম ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বুদ্ধিজীবী হত্যার ঘটনাটি। তা পরের পর্বে

বিপ্লবের ভেতর-বাহির: ৪

হুমায়ুন কবির ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক। তিনি কবি ছিলেন। জীবনানন্দ দাশ নিয়ে তিনি উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রথম কাব্যগ্রস্থ কুসুমিত ইস্পাত ছাপা হয়েছিল ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে।

আজকাল হুমায়ুন কবিরকে নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয় না। তবে সেই সময়ের অনেকের লেখার মধ্যেই পাওয়া যাবে হুমায়ুন কবিরকে। হেলাল হাফিজের কথা আমরা শুনতে পারি-

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে স্পষ্ট এবং সরাসরি আহ্বান জানিয়ে লেখা প্রথম এবং প্রধান কবিতাটি হচ্ছে নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়। এর আগে আর কারও লেখায় এ রকম সরাসরি যুদ্ধের আহ্বান ঘোষিত হয়নি। এবং এই একটি কবিতা আমাকে রাতারাতি বিখ্যাত করে দেয়। আমি লিখতে পারছিলাম না। অস্থিরতার ভেতর দিন কাটাচ্ছিলাম। শেষ পর্যন্ত ৩/৪ পৃষ্ঠা দীর্ঘ একটি কবিতা লিখে ফেললাম। কবিতাটি লেখার পর সেটি কবি হুমায়ুন কবিরকে দেখালাম। তিনি সেটা পড়ে বললেন, এডিট করতে হবে। ৩/৪ পৃষ্ঠার কবিতাটিকে তিনি বললেন ১ পৃষ্ঠায় লিখতে। দুরূহতম সেই কাজটি আমার নিজেরই করতে হবে। কুসুমিত ইস্পাত-এর কবি আমার অতিরিক্ত আবেগ বিহ্বল কবিতাটিকে এডিট করে ১ পৃষ্ঠার পরিসরে আনবার তাগিদ দিয়েছিলেন। ক্রমাগত কাটাছেড়ার ভেতর হঠাৎ করেই নামটিও এসে গেল, 'নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়' অমানুষিক খেটে শেষ পর্যন্ত কবিতাটিকে বর্তমান অবয়বে দাঁড় করালাম।

উৎকৃষ্ট সময় কিন্তু আজ বয়ে যায়।
এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়
এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।

ক্যাম্পাসে সম্পাদিত কবিতাটি পড়ে শোনালাম কবি হুমায়ুন কবির এবং লেখক আহমদ ছফাকে। শুনে দুজনেই প্রচণ্ড আবেগে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'হেলাল, জীবনে তোমার আর কোন কবিতা না লিখলেও চলবে। একটি কবিতাই তোমাকে অমরত্বের দরোজায় পৌঁছে দিয়েছে।' পরদিন তারা দুজনে আমাকে নিয়ে কবি আহসান হাবিবের কাছে গেলেন তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তান অফিসে। কবি হুমায়ুন কবির আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'হেলাল, কবিতা লেখে, ও একটি কবিতা লিখেছে সেটা পড়ে দেখেন।' আমি তাঁর হাতে 'নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়' কবিতাটি দিলাম। তিনি পড়লেন পড়ে বললেন, 'বাবা, তোমাকে একটা কথা বলি, তোমার এই কবিতাটি আমার এই পত্রিকায় ছাপা যাবে না, ছাপলে আমার চাকরিটা চলে যাবে।' হুমায়ুন কবিরের দিকে ফিরে তাকে বললেন, ' কবির তুমি তো বোঝ, ও তো নতুন ও হয়তো অভিমান করবে' । আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ' তবে একটা কথা বলে দিই, তোমার অমরত্ব নিশ্চিত হয়ে গেছে, জীবনে তোমার আর কোনও কবিতা না লিখলেও চলবে।'

এই হুমায়ুন কবির নির্মমভাবে খুন হন ১৯৭২ সালের ৬ জুন। তাঁর স্ত্রী সুলতানা রেবুর স্মৃতিচারণ শুনুন-

হুমায়ুন ওর প্রথম কবিআর বইটি (কুসুমিত ইস্পাত) প্রকাশিত হবার আগে যতরকম শ্রম দেয়া দরকার তার সবটুকু দিয়েছিলে। বইটি ছাপা হবার জন্য সব প্রস্তুতিই ছিল সম্পন্ন। ঐদিন সে কথা জানাতে গেলে ওর শেষ

দেখা হয়েছিল সেলিম আল দীন ও আহমদ ছফার সঙ্গে। প্রচন্ড গরমে ক্লান্ত-বিধ্বস্ত অবস্থায় হুমায়ুন বাড়ি ফিরে এলে সন্ধ্যা নাগাদ আমরা খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাত সাড়ে দশটায় আমি যখন আমার বাড়িওয়ালা ও প্রতিবেশীদের সাহায্য নিয়ে গুলিবিদ্ধ হুমায়ুনকে ঢাকা মেডিক্যালে নিয়ে যাই, তার কিছু পরেই খবর পেয়ে হাসপাতালে অনেকে এসেছিলেন-যাঁদের মধ্যে আমি কেবল আহমদ শরীফ স্যারের কথা মনে করতে পারি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে হুমায়ুন চিরনিদ্রায় শায়িত আছে। কে জানত, একসময়ের প্রিয় আড্ডার জায়গাটিই হবে তার শেষ শয্যা!

কবি হুমায়ুন কবিরকে হত্যা করেছিল পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি। ১৯৭২ সালের ৬ জুন। এর আগে ৩ জুন খতম করা হয়েছিল সেলিম শাহনেওয়াজ বা ফজলুকে। ফজলুকে হত্যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে হুমায়ুন কবিরের মৃত্যুর ঘটনাটি। ফজলুর বিদ্রোহের বড় কারণ ছিল তাঁর প্রেমিকাকে দলের মেনে না নেওয়া। নিশ্চই মনে আছে, ফজলুর প্রেমিকা-স্ত্রীর নাম ছিল মিনু। মিনুকেও বহিস্কার করা হয়েছিল দল থেকে। মিনু ছিল হুমায়ুন কবিরের বোন। বোনকে আশ্রয় ও সমর্থন দিয়েছিলেন তিনি। এটাই ছিল হুমায়ুন কবিরের সম্ভবত একমাত্র অপরাধ। কেবল বোনকে সমর্থন দেওয়ার কারণেই প্রতিভাবান এই মানুষটিকে খতম করা হয়েছিল।
আরও একটি অভিযোগ আনা হয়েছিল হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে। হুমায়ুন কবিরের আরেক ভাই ফিরোজ কবিরও ছিল পার্টির একজন সক্রিয় কর্মী। ১৯৭১ সালে দল গঠনের পর পেয়ারা বাগানে এই ফিরোজ কবিরের সঙ্গে বিরোধ তৈরি হয়েছিল সিরাজ সিকদারের সঙ্গে। তখন ফিরোজ কবিরকে বহিস্কার করা হয়। অভিযোগ করা হয় যে, এই বহিস্কারের সিদ্ধান্তও মেনে নেননি হুমায়ুন কবির।
হুমায়ুন কবিরকে খতম করার পর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে একটি বিশেষ বক্তব্য প্রচার করা হয়েছিল ১৯৭২ এর ১০ জুন। সেখানে কেন হুমায়ুন কবিরকে খতম করা হয়েছে তার যুক্তি তুলে ধরা হয়েছিল।
সেখানে বলা আছে, *'সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ, নাম-যশ করার পুরোপুরি বুর্জোয়া দৃষ্টিকোন সম্পন্ন হওয়ায় স্বভাবতই হুমায়ুন কবিরের মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থের প্রাধান্য ছিল। তাঁর ইচ্ছা ছিল আর.এস.পি-এর নির্মল সেন ও প্রফেসর সিদ্দিকের মতো চাকুরী ও বুর্জোয়া জীবনযাপন করে সর্বহারা পার্টির নেতা হওয়া এবং লেখক হিসাবে নিজেকে জাহির করা। তার এই মনোভাব এবং তার ভাই ফিরোজ কবির সংক্রান্ত পার্টির সিদ্ধান্ত তাকে প্ররোচিত করে ফজলু-সুলতান চক্রের সঙ্গে যুক্ত হতে।'*
আবার পরে আরও বলা হয়েছে, *' এক দিকে সে এ ধরণের কথা বলেছে আর অন্যদিকে ফজলু চক্র ও নিজের বোনকে আশ্রয় দিয়েছে। পার্টি ও নেতৃত্ব বিরোধী অপপ্রচার ও জঘন্য ব্যক্তিগত কুৎসা সম্বলিত দলিলাদি লিখেছে, ছাপিয়েছে এবং বিতরণ করেছে, চক্রের প্রধান প্রতিক্রিয়াশীল বৃদ্ধিজীবী হিসাবে কাজ করেছে। তার উদ্দেশ্য ছিলচক্রান্তকারীদের চর হিসাবে গোপনে পার্টির মাঝে অবস্থান করা যাতে ফজলু চক্রের পতন হলেও সে পার্টির মাঝে লুকিয়ে থাকতে পারে এবং পার্টির বিরাটাকার ক্ষতিসাধন করতে পারে।'*
বিবৃতির সবশেষে ছোট্ট একটা নোট দেওয়া হয়। তাতে বলা হয়, *' প্রতিবিপ্লবী তৎপরতা চালাতে যেয়ে হুমায়ুনি কবির পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির গেরিলাদের হাতে খতম হয়। হুমায়ুন কবিরের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ সরকার যে সকল পদক্ষেপ নিয়েছে তা পাক ফ্যাসিস্টদের হাতে নিহত কোনো বুদ্ধিজীবীদের*

ক্ষেত্রে নেয়নি। তার প্রতি সরকারের বিশেষ প্রীতি কি প্রমান করে না যে, সে সরকারের উঁচুদরের গোপন তাবেদার ছিল?'

ফজলু ও হুমায়ুন কবিরকে খতম করেছিল খসরু। এই খসরু আবার কাজী জাফরের গ্রুপের ক্যাডার ছিল বলে একটি প্রচারণা রয়েছে। তবে খসরুও বাঁচতে পারেনি। ১৯৭৪ সালে কালকীনি উপজেলায় রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্প দখল করতে গিয়ে নিহত হয়েছিল খসরু।

প্রথমে খতমে অংশ নেওয়া গেরিলাদের পুরস্কৃত করা হলেও সর্বহারা পার্টি পরবর্তীতে হুমায়ুন কবিরকে খতম করা ভুল ছিল বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু' পার্টি আগে মনে রাখেনি তাদের মূল নেতা মাও সেতুঙ এর একটি কথা। সেটি হচ্ছে, *'মানুষের মাথা পেঁয়াজের কোষ নয় যে, একবার কেটে ফেললে তা আবার গজাবে'।* ফলে ভুল স্বীকার করলেও হুমায়ুন কবিরকে সর্বহারা পার্টি তাঁর পরিবারের কাছে ফেরত দিতে পারেনি।

পার্টির এক সময়ে সম্পাদক রইসউদ্দিন আরিফ লিখেছেন, *'বিপ্লবী পার্টিতে মতবিরোধ থাকবে। থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মতবিরোধকে কেন্দ্র করে পার্টি কমরেডদেরকে জলেস্থলে-অন্তরীক্ষে যেখানে পাওয়া যায় সেখানেই ধরে জবাই করার উদ্ভট লাইন সর্বহারা পার্টিতে যেভাবে শেকড় গেড়ে বসেছিলো পৃথিবীর আর কোন বিপ্লবী পার্টির ইতিহাসে তার কোনো নজির খুঁজে পাওয়া দুস্কর।'*

সিনেমায়-গল্পে টুইস্ট বলতে একটা কথা আছে। এবারে এই লেখার টুইস্ট। হুমায়ুন কবিরের বন্ধু ছিলেন ফরহাদ মজহার। হুমায়ুন কবিরের খুন হওয়ার পর

ফরহাদ মজহার কবিতায় লিখেছিলেন, *" আমি তোকে ডেকে বলতে পারতুম হুমায়ূন অতো দ্রুত নয়, আরো আস্তে যা।"*অর্থাৎ তার এই বদলে যাওয়াটা মজহারের পছন্দ হয় নি।

বলে রাখি, পুলিশ সে সময়ে ফরহাদ মজহারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল বলে শোনা যায়। এরপরই তিনি আমেরিকা চলে যান।

সবশেষে তাদের আরেক বন্ধু, আহমদ ছফার ডায়েরি থেকে উদ্ধৃতি দেই-

" ভাত খেলাম। কাপড় ধুয়ে দিলাম। ঘুমোলাম। মনওয়ার এবং মসি এসে জাগালো। মসি ছেলেটাকে আমি ভয়ঙ্কর অপছন্দ করি। মনে হয় ছেলেটা কি একটা মতলবে ঘুরছে। আমার ধারণা হুমায়ুনের মৃত্যুরহস্যটা সে জানে। দিনে দিনে এ ধারণাটা আমার মনে পরিষ্কার রূপ লাভ করছে। কেমন জানি মনে হয়, ছেলেটার হাতে রক্তের দাগ লেগে আছে। এ ধরনের ছেলেদের কি করে এড়িয়ে চলবো সেটা একটা সমস্যা। রেবুদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে সম্ভবত। এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করতে পারিনি। আশা করছি এরই মধ্যে নতুন কোনো তথ্য জেনে যাবো। ফরহাদ মজহারের আমেরিকা পলায়ন, সালেহার সঙ্গে স্বামীর পুনর্মিলন এসবের সঙ্গে বোধ হয় হুমায়ুনের মৃত্যুর একটা সম্পর্ক জড়িত রয়েছে।' '

টুইস্ট শেষ। আবার মূল প্রসঙ্গ। আবার সিরাজ সিকদার। তাঁর মৃত্যু নিয়েও অনেক মিথ রয়েছে। এখানেও কি প্রেম-ভালবাসা জাতীয় ব্যক্তিগত সম্পর্ক কাজ করেছিল? আগামি পর্বে এই আলোচনাই

বিপ্লবের ভেতর-বাহির: ৫

আমার কিশোর ভাই, প্রিয় ছিল স্বাধীনতা
শ্লোগানে উত্তাল হোত খুব। দর্পিত বাতাস
তাকে ডাক দিল, স্টেনগানে বাজাল সংগীত

বিরোধী বন্দুক থেকে একটি নিপুণ গুলি
বিদ্ধ তারে করে গেছে, ছিন্ন কুমুদের
শোভা দেহ তার পড়েছিল? জানি না কিসব
ঘাস জন্ম নেবে তার শয়নের চারপাশে, . . .

বিরোধী গুলির ক্ষতে যখন সুস্থির শুয়ে
আকাশের নীচে, চোখে তার বিস্মিত আকাশ
মানবিক সত্যরীতি, বঙ্গদেশ সুখের বাগান।

কবিতাটি লিখেছিলেন কবি হুমায়ুন কবির, তাঁর ছোট ভাই ফিরোজ কবিরকে নিয়ে। তাঁর কিশোর ভাইটি বরিশালে ১৯৭১ সালে আগস্ট মাসে পাক সেনাদের হাতে ধরা পড়েছিলেন। ১৮ আগস্ট বরিশালে ব্যাপ্টিস্ট মিশন সংলগ্ন খালপাড়ে দাঁড় করিয়ে এই বীর মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করা হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্রের একটি বড় কাজ মুক্তিযুদ্ধের কথ্য ইতিহাস। স্বরূপকাঠি গণপতিকাঠি গ্রামের শোভারাণী মন্ডল সরাসরি যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁরও একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল।

প্র: আপনি যে দু'টো মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপে অংশগ্রহণ করেছিলেন সেই দু'টো গ্রুপের উচ্চ পর্যায়ে অর্থাৎ লিডিং পর্যায়ে কারা ছিলেন ?
উ: শেষের গ্রুপটায় লিডিং পর্যায়ে ছিলেন বেণীলাল দাশগুপ্ত। আর প্রথম পর্যায়ের লিডিং ম্যান ছিলেন সালাম ভাই ওরফে সিরাজ সিকদার। সেই ছিলো প্রথম ম্যান। দ্বিতীয় ম্যান ছিলো মজিবুল হক, তৃতীয় ম্যান ছিলো ফিরোজ কবির। কবিতা লেখে যে হুমায়ুন কবির তারই ভাই ফিরোজ কবির। আর কারো কথা আমার তেমন মনে নাই।

এই ফিরোজ কবির ছিলেন পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য। মুক্তিযুদ্ধের সময় ৩ জুন পেয়ারা বাগানে যে দলটির সৃষ্টি তা আমরা আগেই জেনেছি। যুদ্ধের সময়েই সিরাজ সিকদারের মতের সঙ্গে মিল হয়নি ফিরোজ কবিরের। দল থেকে বহিস্কার করা হয় ফিরোজ কবিরকে। সদ্য গঠিত পার্টির এই সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতের জন্য মোটেই ভাল হয়নি।

ফিরোজ কবিরের বড় ভাই হুমায়ুন কবির আগে থেকেই সিরাজ সিকদারের পার্টির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। সিরাজ সিকদার বরিশালের বিএম কলেজের ছাত্র ছিলেন। তখনই পরিচয় হয় হুমায়ুন কবিরের সাথে। সম্পর্কটা ছিল পার্টি গঠনেরও অনেক আগে থেকে। দুজনেই বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন, দুজনেই মার্কসবাদি। দুজরেই পরে পিকিং লাইন বেছে নেন। বিশ্বাস করতেন সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নতুন একটি দেশের স্বপ্ন।
সর্বহারা পার্টির প্রতিষ্ঠা আটঘর কুড়িয়ানার পেয়ারা বাগানে, ৩ জুন ১৯৭১, যুদ্ধের মধ্যে। আরও অনেক

চীনাপন্থীদের মতো ভুল করেননি সিরাজ সিকদার। যুদ্ধের অনেক আগে থেকেই মূল শত্রু চিনতে ভুল করেননি। ফলে অনেক আগেই পাকিস্তানি শোষনের বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিলেন। ঢাকায় বিভিন্ন জায়গায় বোমা হামলার কাজটি আগেই করেছিলেন সিরাজ সিকদাররা। হুমায়ুন কবির আগে থেকেই যুক্ত সিরাজ সিকদারের সঙ্গে।

অসহযোগ আন্দোলনের সেই সময়ের হুমায়ুন কবিরকে পাওয়া যায় নির্মলেন্দু গুণের এক লেখায়।

> *'আমি আর হুমায়ুন কবির পাবলিক লাইব্রেরির সামনের রাস্তা দিয়ে শাহবাগের দিকে ছুটে যাওয়া একটি ডাবল ডেকার বাসে গতিরোধ করি। হুমায়ুন কবির তখন আমার কাছ থেকে একটা দিয়ালশাই চেয়ে নেয়। তার আগে অগ্নিসংযোগে ব্যবহার করার জন্য সে তার প্রেমিকা সুলতানা রেবুর কাছ থেকে ওর র''মালটি চেয়ে নিয়ে এসেছিল। হুমায়ুন কবির বলে: আয় বাসে কী করে অগ্নিসংযোগ করতে হয়, তোকে শিখিয়ে দিচ্ছি। হুমায়ুনের কাছেই আমি বাসে অগ্নিসংযোগ করা শিখি।'*
> *(আমার কণ্ঠস্বর, নির্মলেন্দু গুণ)*

হুমায়ুন কবির আর ফিরোজ কবিরের ছোট বোন আলমতাজ বেগম ছবি। পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির আরেক সক্রিয় সদস্য ও মুক্তিযোদ্ধা। হাতের লেখা ভাল ছিল বলে ছবি পোস্টার দিলে দিতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনিও যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। তখন তিনি নবম শ্রেনীর ছাত্রী, বয়স ১৬ বছর বা সামান্য বেশি। যুদ্ধ শুরু হলে ফিরোজ কবির আর তাঁর বন।দুদের মুখে যুদ্ধের কথা শুনে শুরে যাওয়ার কথা বলে রেখেছিলেন ছবি। পাক সেনারা মেয়েদের ধরে নিয়ে যেতো। তাই পালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে যুদ্ধ করাটাই ঠিক বলে মনে করেছিলেন আলমতাজ বেগম নামের কিশোরী মেয়েটি।
এখানে উল্লেখযোগ্য চরিত্র আরও একটি আছে। সেলিম শাহনেওয়াজ। ফিরোজ কবিরের বন্ধু, একই সঙ্গে পড়তেন। তিনিও সিরাজ সিকদারের ঘনিষ্ঠ। সেলিম শাহনেওয়াজ ও ছবি, একে অপরকে পছন্দ করতেন।

যুদ্ধ শুরু হলে এরা সবাই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। ছবির ভাষায় পড়তে পারি আমরা:

> *সিরাজ শিকদারের সঙ্গেও আমি একটা অপারেশনে গিয়েছিলাম। সেটি ছিল স্বরূপকাঠির সন্ধ্যা নদীতে। পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে আমাদের গেরিলা যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে সেলিম শাহনেওয়াজ ছিলেন। সেই যুদ্ধে আমিই প্রথম পাকিস্তানি বাহিনীর গানবোটে গ্রেনেড ছুড়ে মারি। আমি যখন গ্রেনেডের পিনটা খুললাম, তখন বুকের মধ্যে ধড়ফড় করছিল, কী জানি, গ্রেনেডটা যদি আমার হাতেই বিস্ফোরিত হয়! হামলায় গানবোটের সব পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের দোসররা মারা যায়। আমার নেতৃত্বেও হানাদার বাহিনীর সঙ্গে গেরিলাযুদ্ধ হয়েছিল। ঝালকাঠির গাবখান চ্যানেল দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর একটি স্পিডবোট যাচ্ছিল। খবরটা আমরা আগেই পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, সেখানে ছয়-সাতজন মিলে হামলা চালাব। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করার মতো অস্ত্র আমাদের ছিল না। সিরাজ শিকদারের নির্দেশে আমি গেরিলা কায়দায় পাকিস্তানি গানবোটে গ্রেনেড আর হাতবোমার হামলা করি। আমার হামলায় গানবোট নদীতে ডুবে যায়। এবারও গানবোটের সব পাকিস্তানি সৈন্য মারা যায়।*

রাজাকারকে বেয়নেট চার্জ করার উদাহরণও আছে ছবির জীবনে। সেলিম শাহনেওয়াজের সঙ্গে ছবির বিয়ে হয় রণাঙ্গণেই।

> *একাত্তরের ২৮ মে। যুদ্ধের ক্যাম্পে গুলির শব্দ, বারুদের গন্ধের মধ্যেই বিয়ে হলো আমার। বর সহযোদ্ধা সেলিম শাহনেওয়াজ। সহযোদ্ধারা সবাই বেশ আনন্দ-ফুর্তি করে ফুল দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে, আমাদের বিয়ে হয়েছে।*

দুই ভাই আর এক বোনের এই জীবন এর পর একই রকম আর থাকেনি। সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টি আর সিরাজ সিকদার তাদের জীবনের উপর বড় ধরণের আঘাত নিয়ে আসে। কেবল মতের মিল হয়নি বলে সর্বহারা পার্টিতে অসংখ্য খুনোখুনি হয়েছে। আর এর শুরুটা হয়েছিল এই পরিবারটি দিয়েই।
ফিরোজ কবির এক অর্থে ভাগ্যবান। তিনি শহীদ হয়েছিলেন পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে। তারপরেও পার্টির দলিলে তাকে বহিস্কারের অপবাদ নিতে হয়েছে। শহীদ হওয়ার মর্যাদা তাকে নিজের দলই দেয়নি। কারণ তিনি সিরাজ সিকদারের বিরোধীতা করেছিলেন।
যুদ্ধের সময় পেয়ারাবাগান থেকে একটা পর্যায়ে এসে সিরাজ সিকদারকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এ নিয়ে সিরাজ সিকদার পরে লিখেছেন, তিনি প্রত্যাহারের পক্ষে ছিলেন না, কিন্তু অন্য নেতা-কর্মীদের চাপে সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ প্রাণের ভয়ে নয়। প্রত্যাহারের পক্ষে ছিলেন ফজলু ও তারেক।
সিরাজ সিকদার পরে আরও লিখেছেন, ফজলু-তারেক কমরেড সিরাজ সিকদারের উপস্থিতিতে তাদের ইচ্ছা খুশীমত কার্যকলাপ করতে পারতো না।
সিরাজ সিকদারের লেখা ইশতেহারে আরও বলা হয়েছে,

> *‘কমরেড সিরাজ সিকদারের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ফজলু তার প্রেমিকাকে নিয়ে পলায়ন করে, তারেক-মুজিব ষড়যন্ত্র করে কমরেড ফারুক মজিদকে হত্যা করে, সমরবাদী নেতা বনে যান, ১নং ফ্রন্টের চরম ক্ষতিসাধন করে, নারীদের নিয়ে স্বেচ্ছাচার করে।’*

সিরাজ সিকদারের এ কথাগুলো ফজলু-তারেকের মৃত্যুর পর লিখিত। ফলে এখানে অভিযুক্তদের বক্তব্য জানার আর কোনো উপায় নেই।

একটি নতুন নাম নেওয়া গোপন পার্টিগুলোর নিয়ম। ফিরোজ কবিরেরই পার্টি নাম ছিল তারেক। সেলিম শাহনেওয়াজ ছিল পৈত্রিক নাম। পার্টিতে নাম ছিল একাধিক। যেমন আহাদ, ফজলু। তবে তিনি ফজলু নামেই ছিলেন বেশি পরিচিত।
তারেককে বহিস্কারের কারণ পাওয়া যায় ১৯৭২ সালের জুনে প্রকাশিত পার্টির একটি বিবৃতিতে। এর শিরোনাম ছিল, ‘বিশ্বাসঘাতক ফজলু চক্র কর্তৃক প্রচারিত পুস্তিকা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি’। সেখানে বলা আছে,

> *‘তারা ষড়যন্ত্র করে কমরেড মজিদকে হত্যা করে, সমরবাদী হয়ে উঠে, বন্দুকের নলের মুখে গেরিলা ও পার্টি কর্মীদের সন্ত্রস্ত রাখে, পার্টির কেন্দ্রকে অস্বীকার করে, নারীদের নিয়ে স্বেচ্ছাচার করে, বিনা অনুমতিতে বন্দুকের ডগায় বিয়ে করে, পার্টির সুনাম নষ্ট করে, পাক-ফ্যাসিস্টদের অনুরূপ কাজ করে। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সর্বহারা পার্টির গেরিলা ও কর্মীরাই মুজিব-তারেককে*

> *খতম করার পরিকল্পনা করছিল। তাদের জীবিত অবস্থায় বিচার সম্ভব হয়নি, কারণ তারা পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের হাতে মারা যায়।'*

যুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশে সিরাজ সিকদারের দল পরিচালনা ও মতবাদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করেছিলেন ফজলু। সেই কাহিনী আমরা আগেই পড়েছি। পার্টির বিভিন্ন দলিলে বিশেষ করে ১৯৭২ সালের প্রায় সবগুলো দলিলে বার বার এসছে ফজলুর নাম। ইশতেহার বা বিবৃতিগুলো সিরাজ সিকদার নিজে লিখতেন বলে সেগুলো সিরাজ সিকদার রচনা সমগ্রতে স্থান পেয়েছে। সিরাজ সিকদার বার বা ফজলু চক্রের কথা বলেছেন, নানা ধরণের অভিযোগ তুলেছেন, দল থেকে বহিস্কার ও খতমের যুক্তি তুলে ধরেছেন। সেরকম কিছু কথা বলা যেতে পারে:
এক জায়গায় সিরাজ সিকদার লিখেছেন,

> *' ফজলু চক্র ইতিমধ্যে কাজী-মেনন (কাজী জাফর, এরশাদের দলের নেতা এখন এবং রাশেদ খান মেনন) চক্রের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তারা এ চক্রকে সর্বহারা পার্টি, তার নেতৃত্বে বিশেষ করে কমরেড সিরাজ সিকদারকে খতম বা অপসারণের জন্য মদদ জোগাচ্ছে। তারা এই চক্রকে অস্ত্র, লোক অর্থাৎ সব কিছুই দিচ্ছে।.........তাদের এই দালালীর খবর কাজী-রণো চক্রের পান্ডা মেনন-জামাল হায়দার আমাদের জনৈক সহানুভূশীলের নিকট প্রকাশ করেছে।' (এই জামাল হায়দারও এরশাদের মন্ত্রী হয়েছিলেন।)*

সর্বহারা দলে ছিল সিরাজ সিকদারের একক নেতৃত্ব। অর্থাৎ সিরাজ সিকদারই পার্টি। জানা যায়, এ বিষয়ে তাঁর মনোভাব ছিল অত্যন্ত কঠোর। হঠাৎ করে এক গরীব কৃষকের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন সিরাজ সিকদার। এরপর বিয়ে করেন জাহানারা হাকিমকে। তবে বিয়ের আগে এই দুইজন দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকতেন। নিজে এ ধরণের জীবনযাপন করলেও পার্টির অন্য কেউ এ ধরণের সম্পর্কে জড়ালে তা মানতেন না তিনি। এ নিয়েও পার্টির মধ্যে নানা সময়ে সংকট দেখা দিয়েছিল। সেলিম শাহনেওয়াজ আর ছবি বা ফজলু-মিনুকে মানতে পারেননি সিরাজ সিকদার। আলমতাজ বেগম ছবির নাম দলে ছিল মিনু। সিরাজ সিকদারের সমালোচকদের কোনো জায়গা দলে ছিল না।

সিরাজ সিকদার লিখেছেন,

> *'ফজলু যৌন স্বার্থকে বিপ্লবী স্বার্থের অধীন না করে বিপ্লবী স্বার্থকে যৌন স্বার্থের অধীন করে, পার্টির পদ ও নাম-যশের জন্য কাজ করে। তাকে এর জন্য বিপ্লবে যোগদানের প্রথম থেকেই সমালোচনা করা হয়, শেষ পর্যন্ত পার্টি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তখন সে চক্র গঠন করে। কাজেই যৌনের স্বার্থ, পদের স্বার্থ, নাম-যশের স্বার্থ অর্থাৎ ব্যক্তিস্বার্থ অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেনীস্বার্থের কারণই চক্র গঠনের মূল কারণ।'*

১৯৭২ সালের মে মাসে প্রচারিত কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের এক ইশতেহারে বলা আছে, *'ফজলু চক্রের সাথে মিনু (ফজলু চক্রের স্ত্রী) পার্টি পরিত্যাগ করে পলায়ন করেছে'*।

ফজলুর এই বিদ্রোহ মাত্র দুই মাস টিকেছিল। ১৯৭২ সালের ৩ জুন ছিল সর্বহারা পার্টির প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। দলটি প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করে পার্টিরই একজন সক্রিয় নেতা সেলিম শাহনেওয়াজের খতম করার মধ্য দিয়ে। ১৯৭২ সালের ১০ জুন এ নিয়ে একটি বিশেষ ইশতেহার বের করেছিল সর্বহারা পার্টি।
সিরাজ সিকদার সেখানে বলেছেন,

> *‘ফজলু চক্র পূর্ব বাংলার কোনো এক স্থানে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি বিরোধী তৎপরতা চালাতে গেলে সেখানকার পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির বীর গেরিলারা নিজস্ব উদ্যোগে ৩রা জুন ফজলু চক্রকে দেশীয় অস্ত্রের সাহায্যে খতম করে। মৃত্যুর সময়ে কাপুরুষ ফজলু চক্র গেরিলাদের পায়ে ধরে প্রাণ ভিক্ষা চায়। কিন্তু শ্রেনী সচেতন গেরিলারা ‘পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি-জিন্দাবাদ’, কমরেড সিরাজ সিকদার-জিন্দাবাদ’ শ্লোগান দিতে দিতে তাকে খতম করে। ’*

আলমতাজ বেগম ছবি এখন থাকেন পটুয়াখালির পাথর ঘাটায়। দেশের মানুষের মুক্তির জন্য তিনি বিপ্লব করতে মাত্র ১৬ বছর বয়সে যুদ্ধে যান, যোগ দেন সর্বহারা পার্টিতে। কিন্তু বাকি জীবন তাঁকে টিকে থাকার জন্য নিজের জীবন নিয়ে বিপ্লব করতে হয়েছে। সেলিম শাহনেওয়াজ যেদিন মারা যান সেদিন তিনি ছিলেন তিন মাসের অন্তঃসত্বা। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে জন্ম নেয় মেয়ে সিমু, পুরো নাম সেলিম শাহনেওয়াজ সিমু।

৩ জুন ছবি ছিলেন খুলনায়। আর সেলিম শাহনেওয়াজ ঝালকাঠি থেকে ফিরছিলেন। ছবি জানালেন, সেলিম শাহনেওয়াজ জানতেন তাঁর জীবন যে ফুরিয়ে আসছে। বলতেন, এই জীবনে একবার আসলে আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। সেলিম শাহনেওয়াজকে খতম করা হয় লঞ্চঘাটে। খতমের পর লাশ ভাসিয়ে দেওয়া হয় সুগন্ধা নদীতে। সেই লাশ আর কখনো কেউ দেখেনি।
সম্ভবত ঝালকাঠির লঞ্চঘাটে যাওয়ার আগেই সিরাজ সিকদারের অনুসারিরা সেলিম শাহনেওয়াজকে ধরে ফেলে। আলোচনার জন্য নিয়ে যায় লঞ্চঘাটে। এই দলের দুইজনের নাম জানা যায়। একজন রিজভী, অন্যজন বাদল। ইশতেহারে আছে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে খতম করা হয়েছে।
ছবি জানালেন, সেলিম শাহনেওয়াজকে মারা হয়েছিল পটাসিয়াম সায়ানাইড প্রয়োগ করে। তারপর লাশ ভাসিয়ে দেওয়া হয় নদীতে। রিজভী সেই পটাসিয়াম সায়ানাইড একবার দেখিয়েছিল ছবিকে। কিন্তু ছবি তখন জানতেন না এই বিষ তাঁরই স্বামীর জন্য। এই রিজভীও এক বছর পর দলীয় কোন্দলে দলের অন্যদের হাতেই খতম হয়েছিলেন। অথছ ফজলুকে মারার জন্য রিজভীদেরকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। খতমের জন্য ছবিকেও খুঁজেছিল, কিন্তু না পাওয়ায় প্রাণে বেচে যান তিনি।
সেলিম শাহনেওয়াজের লাশ সুগন্ধা নদীতে ভাসলেও সেই খবর ছবি চেয়েছিলেন আরও তিন দিন পর। তাঁর বড় ভাই হুমায়ুন কবিরের মৃত্যুর পর। হুমায়ুন কবির খতম হন ৬ জুন, সর্বহারা পার্টির সদস্যদের হাতে। এই খবর যখন পাওয়া যায়, তখনও ছবি জানতেন না যে তার স্বামী আগেই খতম হয়েছেন। সেলিম শাহনেওয়াজ মারা যাওয়ার দুদিন আগেও হুমায়ুন কবিরের বাসায় স্ত্রীসহ গেছেন, খাওয়া দাওয়া করেছেন। সেই ছিল শেষ দেখা।

আমরা আগেই জানি কবি-গবেষক-শিক্ষক হুমায়ুন কবির অনেক আগে থেকেই সিরাজ সিকদারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তারেক বা ফিরোজ কবির ও মিনু বা ছবির ভাই হওয়ার অপরাধ তো ছিলোই, এর সঙ্গে যুক্ত হয় সিরাজ সিকদারের সঙ্গে দল পরিচালনায় মতভেদ। এই 'বিরাট' অপরাধের জন্য তাঁরও জীবন চলে যায়।

হুমায়ুন কবির প্রসঙ্গ একটু আগে থেকে শুরু করা যাক। তাঁর স্ত্রী, সুলতানা রেবু এতোবছর পর, ২০১২ সালের ২ মে লিখেছেন,

> *'হুমায়ুনের সঙ্গে আমার পরিচয় পর্বটা এই রকম-আমরা দু'জনই একই শহরে (বরিশাল) বড় হয়েছি, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগে কেউ কাউকে দেখিনি। হুমায়ুনের পিঠাপিঠি বড়বোন মমতা পড়ত আমার সঙ্গে। আমাদের বাড়িতে সব ভাইবোনের গল্পের বই পড়ান নেশা ছিল, কিন্তু সেই অনুপাতে কিনে পড়ার সামর্থ্য বেশি ছিল না। বন্ধুদের অফুরান সাপ্লাই পেয়ে যেতাম। মমতা নিজে দিতে না পারলেও ভাইয়ের (হুমায়ুন) কাছ থেকে বই এনে দিত। ১৯৬৫ সালে দু'জনেই উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হই। ১৯৬৬ সালের শেষের দিকে লাইব্রেরির বারান্দায় প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে হুমায়ুনের সঙ্গে আমার প্রথম কথা হয়। আমার হাতে ছিল লাইব্রেরি থেকে নেয়া অনেকগুলো বই আর বাইরে ঝড়বৃষ্টি-হুমায়ুনের ইচ্ছা ছিল আমার কিছু বই হল-গেট পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। আমি বলেছিলাম, 'যে ভার আমি বইতে পারি না, সেটা আমি নেই না।' আমাদের গুরু অধ্যাপক আহমদ শরীফের কাছে ঘটনাটি পরদিনই পৌঁছে যায়। শরীফ স্যার উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, 'চালিয়ে যাও, হবে।'*

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সুন্দর একটি বর্ণনা দিয়েছেন এই দুজনের সম্পর্কের।

> *'১৯৬৮-৬৯-এর দিকে কী একটা কারণে যেন একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে গিয়ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে করিডোরে প্রাণের রঙিন উচ্ছলতাঐনা আমাদের সময়ের মতোই চঞ্চল-স্রোতে বয়ে চলেছে। হুমায়ুন আমাকে ওর কিছু সহপাঠী-সহপাঠিনীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। তাদের মধ্যে একটি মেয়ে আলাদা করে চোখে পড়ার মতো। মাজা ফরসা রঙের ছিপছিপে দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটির লম্বা বেণী পিঠের উপর দুলছে, চাউনি সপ্রতিভ। বিকেলে হুমায়ুন বাসায় এলে বললাম: বেশ সুন্দর তো মেয়েটি! কে? এত সুন্দর একটা মেয়ে তোমার সহপাঠিনী আর তুমি এখনোআর প্রেমে পড়োনি।*
>
> *হুমায়ুন ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলল। আমি-যে ওর অজান্তে মেয়েটার জন্য ওর ভেতরের কাতরতা টের পেয়ে গেলাম, ও বুঝল না।*
>
> *জিজ্ঞেস করলাম, নাম কী মেয়েটার?*
>
> *ও বলল, সুলতানা রেবু।*
>
> *এর দিন কয়েক পরেই হুমায়ুন এসে ওদের প্রেমের সুখবরটা দিল। হ্যাঁ, ঐ মেয়েটিই। এর পরে শুরু হল ওর প্রেমে আর কবিতায়-ভরা মাতাল দিনগুলো।*

এই মেয়েটিকে নিয়ে একটা কবিতা আমরা সংগ্রহে রাখতে পারি।

পার্শ্ববর্তিনী সহপাঠিনীকে

কি আর এমন ক্ষতি যদি আমি চোখে চোখ রাখি
পদাবলী প'ড়ে থাক সাতাশে জুলাই বহুদূর
এখন দুপুর দ্যাখো দোতালায় পড়ে আছে একা
চলো না সেখানে যাই। করিডোরে আজ খুব হাওয়া
বুড়ো বটে দু'টো দশে উড়ে এল ক'টা পাতিকাক।
স্নান কি করনি আজ? চুল তাই মৃদু এলোমেলো
খেয়েছ ত? ক্লাশ ছিল সকাল ন'টায়?
কিছুই লাগে না ভালো; পাজামা প্রচুর ধুলো ভরা
জামাটায় ভাঁজ নেই পাঁচদিন আজ
তুমি কি একটু এসে মৃদু হেসে তাকাবে সহজে
বলনি ত কাল রাতে চাঁদ ছিল দোতালার টবে
নিরিবিলি ক'টা ফুলে তুমি ছিলে একা।
সেদিন সকালে আমি, গায়ে ছিল ভাঁজভাঙা জামা
দাঁড়িয়ে ছিলাম পথে হাতে ছিল নতুন কবিতা
হেঁটে গেলে দ্রুত পায়ে তাকালে না তুমি
কাজ ছিল নাকি খুব? বুঝি তাই হবে।
ওদিক তাকাও দ্যাখো কলরব নেই করিডোরে
সেমিনার ফাঁকা হল হেডস্যার হেঁটে গেল অই।
না – না – যেও না তুমি চোখে আর তাকাব না আমি
বসে থাকি শুধু এই; এইটুকু দূরে বই নিয়ে
এ টেবিলে আমি আর ও টেবিলে তুমি নতমুখী।
- হুমায়ুন কবির/ কুসুমিত ইস্পাত -

তাঁদের বিয়ে হয়েছিল ১৯৬৯ সালে।

১৯৭২ সালের ৬ জুন, সময় রাত প্রায় সাড়ে ১০টা। হুমায়ুন কবির, স্ত্রী সুলতানা রেবু তখন থাকতেন ছেলে সেতু ও মেয়ে খেয়াকে নিয়ে ইন্দিরা রোডের একটি বাড়িতে। সেই রাতে অসহ্য গরম পড়েছিল। সুলতানা রেবু জানালেন, হুমায়ুন কবির কখনো খালি গায়ে থাকতেন না। শীত কি গরম, একটা গেঞ্জি থাকতোই। কিন্তু সেই রাতে হুমায়ুন খালি গায়ে ছিলেন। সারাদিনের ক্লান্ত সুলতানা রেবু তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাই কখন হুমায়ুন কবির খালি গায়ে বাইরে গেল জানতে পারেননি। হুমায়ুন কবির বাসার সামনের খালি মাঠটায় শুয়ে ছিলেন, মনে হচ্ছিল তীব্র গরমে খানিকটা স্বস্তির আশায় খোলা আকাশের নীচে শুয়ে আছেন। বাড়িওয়ালা বা পাশের বাসার ছেলে বাইরে থেকে আসছিল। তারাই প্রথম দেখেন হুমায়ুন কবিরকে। দ্রুত এসে খবর দেন সুলতানা রেবুকে। ১৯৭২ সালের সেই রাতে কোথা থেকে একটা বেবিটেক্সি এনে দ্রুত নেওয়া হয় ঢাকা মেডিকেলে, কিন্তু বাঁচানো যায়নি। মাথার পেছনে ঠেকিয়ে গুলি করা হয়েছিল।
সর্বহারা পার্টির দুইজন এসেছিলেন একটা সাইকেলে চড়ে। একজন মাঠেই ছিলেন, আরেকজন এসে কথা

বলার জন্য ডেকে নিয়ে যান। নিশ্চই এই লোকটি খুব পরিচিত ছিলেন হুমায়ুন কবিরের কাছে, ফলে খালি গায়েই তিনি চলে যান তার সঙ্গে সামনের মাঠে। মাঠে অপেক্ষায় ছিলেন আরেকজন। সম্ভবত তিনিই পেছন থেকে গুলি করে হুমায়ুন কবিরকে।

কে হত্যা করেছিল। অনেকেই খসরু নামের একজনের কথা বলেন। প্রকৃতপক্ষে হুমায়ুন কবিরকে খুন করেছিল জামিল। জামিল তার দলের নাম। প্রকৃত নাম মালেক। এই মালেক এখনও জীবিত আছেন। যে পিস্তলটি দিয়ে গুলি করা হয়েছিল সেটি থাকতো ইকবাল নামের একজনের কাছে। হুমায়ুন কবিরকে হত্যার আগে, তার কাছে থাকা দুটি পিস্তল আর একটি এসএমজি নিয়ে নেওয়া হয়। সেই পিস্তল দিয়েই খুন হন হুমায়ুন কবির।

হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করানো হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পর। দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনা হয়েছিল। ভাইয়ের বহিস্কারাদেশ মেনে না নেওয়া, বোনকে আশ্রয় দেওয়া, বোনের স্বামীকে সমর্থন করা এই ছিল তাঁর বড় অপরাধ। সাহিত্যিক হতে চেয়েছেন এটাও ছিল দলের চোখে অপরাধ। তাঁর পরিবারকে বলা আখ্যা দেওয়া হয় সামন্তবাদী বংশ। সংসার করাকে বলা হয় বুর্জোয়া জীবনযাপন।

মতভেদ শুরু হয়েছিল সিরাজ সিকদারের দল পরিচালনা ও ব্যক্তিগত জীবনযাপন নিয়ে। আর এর পরিণতিতে পুরো একটি বংশ বিপর্যয়ের মুখে পরে যায়। হুমায়ুন কবির যে গোপন একটি দলের সঙ্গে একটি যুক্ত তা সবাই জানতেন। সময়টা ছিল এমনই যে, তরুণদের একটি বড় অংশই আকৃষ্ট হয়েছিল বিপ্লবী দলগুলোর প্রতি। এর মধ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধে সুস্পষ্ট অবস্থানের কারণে সর্বহারা দলে যোগ দেওয়া মানুষের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি। আজকের বিখ্যাত অনেকেই সেই সময়ে গোপন এই দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। আজকের একজন বড় যাদুকর ছিলেন সেরকম একজন। কিন্তু তাদের মধ্যে অত্যন্ত অল্প সময়ে জীবন দিতে হল প্রতিভাবান এই মানুষটিকে।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেছিলেন,

> *'তাঁর প্রথম কবিতার বইয়ের নাম ছিল কুসুমিত ইস্পাত। এই ফুল আর ফলা একই সঙ্গে ছিল ওর মধ্যে। প্রেমের কোমলতার পাশাপাশি বিপ্লবের রক্তস্নানেও ছিল ওর একইরকম উৎসাহ।'*

শেষ পর্যন্ত রক্তস্নানই হল বিপ্লবী হুমায়ুন কবিরের।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই বন্ধু ফরহাদ মজহারকে নিয়ে পুলিশ টানাটানি করেছিল। আহমদ ছফাও বাদ যাননি। ফরহাদ মজহারকে সন্দেহ করার ইঙ্গিত আছে আহমদ ছফার লেখায়। তবে এরা কেউ জড়িত ছিলেন বলে হুমায়ুর কবিরের পরিবারের সদস্যরাও মনে করেন না। হুমায়ুন কবিরের মৃত্যুর পর কণ্ঠস্বর পত্রিকা একটি সংখ্যা তাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। সেখানে ফরহাদ মজহারের একটা কবিতা ছিল। তিনি লিখেছিলেন,

আমি বলতে পারতুম যেমন বন্ধুরা আমাকে বলে
আমি বন্ধুর মতোন গ্রীবা উঁচিয়ে বলতে পারতুম
হুমায়ুনের কাঁধে হাত রেখে বলতে পারতুম, 'হুমায়ুন
আয় আমার সঙ্গে বোস, আমরা কিচ্ছু না-ছুঁয়ে বসে থাকব।'

জানিয়ে দিতে পারতুম ইস্পাতের-সঙ্গে কুসুমের-ভালবাসা ভালো নয়,
ভালো নয় সেতুর উপর দাঁড়িয়ে খেয়ার জন্যে অপেক্ষা করা
ভালো নয় ইন্দিরা রোডে রেবুকে ফেলে লেখক শিবিরে
মেতে থাকা
বলতে পারতুম 'অত দ্রুত নয় হুমায়ুন,   আস্তে আস্তে যা'

এই লেখাটি আমাদের সবার খেয়াদিকে উৎসর্গ করা। অদিতি কবির খেয়ার সহায়তা ছাড়া এই লেখা সম্ভব ছিল না।

(এতো কিছুর পরেও সিরাজ সিকদারের বিপ্লবের আয়ু বেশিদিন ছিল না। খুব কম সময়ের মধ্যেই তাঁর জীবনেও বিপর্যয় নেমে আসে। সিরাজ সিকদার ধরা পড়া নিয়েও আছে নানা গল্প। সেখানেও আছে ব্যক্তিগত সম্পর্কের গল্প। পরের পর্বে তা)

বিপ্লবের ভেতর-বাহির: শেষ পর্ব

সিরাজ সিকদার নিয়ে বিপাকে পড়েছিলেন শেখ কামালও। বলা যায় তিনি গুলি খেয়ে মরতে বসেছিলেন। মরেন নাই শেষ পর্যন্ত, তবে ব্যাংক ডাকাতের একটা তকমা দীর্ঘদিন ধরে শেখ কামালের নামের সঙ্গে জুড়েছিল। এখনও হয়তো কেউ কেউ তা বিশ্বাসও করেন। অনেকের জানা সেই গল্পটা আগে বলি।

সময়টা ছিল ১৯৭৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর, বিজয় দিবসের দিবাগত রাতে। সারা শহরে গুজব ছড়িয়ে পড়ে, সিরাজ সিকদারের দল ঢাকায় সরকারি বিরোধী লিফলেট প্রচার ও হামলা করবে। এই আশঙ্কায় সাদা পোশাকে পুলিশ রাতে সিরাজ সিকদারের দলবলের খোঁজে টহল দিতে থাকে। ওই রাতেই সিরাজ সিকদারকে ধরতে বন্ধুদের নিয়ে একটি সাদা মাইক্রোবাসে বের হন বঙ্গবন্ধু পুত্র শেখ কামাল। বলা ভাল পুলিশ টহল দিলেও তারা সিরাজ সিকদার বাহিনীকে ভয় পেতো। সাদা পোশাকের পুলিশ সাদা রঙের মাইক্রোবাসটি দেখতে পায়। আতঙ্কিত পুলিশ কোনো ধরণের সংকেত না দিয়েই মাইক্রোবাস লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। গুলিতে আহন হন কামালসহ ছয়জন। শেষ কামালকে সেই রাতেই পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শেখ কামালের কাধে গুলি লেগেছিল। সার্জেন্ট কিবরিয়া গুলি করেছিলেন। আর ঘটনাস্থল ছিল মতিঝিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে।

মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অব) বীরবিক্রম লিখেছেন,

> *প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব কামালের ওই রাতের অবাঞ্ছিত ঘোরাফেরায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মনঃক্ষুন্ন হন। প্রথমে তিনি তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যেতে পর্যন্ত অস্বীকৃতি জানান। পরে অবশ্য গিয়েছিলেন।*

আরও জানায় যায়, অল্পের জন্য শেখ কামালের শ্বাসনালীতে গুলি লাগেনি। তবে এই ঘটনার জন্য বঙ্গবন্ধু পুলিশ বাহিনীকে কোনোরকম দোষারোপ করেননি। বরং ক্ষুব্ধ হয়ে শেখ কামালের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,

> *'তাকে মরতে দাও।'*

কিন্তু চালু মিথ হচ্ছে শেখ কামাল ব্যাংক ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিশের গুলি খেয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে এটা মানুষকে বলা হয়েছে। এখনও হয়তো অনেককে বিশ্বাস করেন।

অনেক মিথ আছে সিরাজ সিকদারকে নিয়ে। এটা ঠিক যে, স্বাধীনতার পর যে দুটি দল মুজিব সরকারকে চরম বিপাকে ফেলছিলে তার মধ্যে সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টি অন্যতম। আরেকটি দল হচ্ছে জাসদ। তবে সরকারের দমন নীতি জাসদের তুলনায় সর্বহারা দলের উপরই ছিল বেশি তীব্র। ১৯৭৩ সালই হচ্ছে পার্টির স্বর্ণসময় আর ৭৪ ছিল ব্যাপক বিকাশের সময়। সদস্য সংখ্যাও ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকে। এতে পার্টির লাভ-ক্ষতি দুটোই হয়। কারণ বিকাশের সুযোগে নানা ধরণের অবাঞ্ছিত মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটে। এর ফলাফল পরবর্তীতে ভাল হয়নি।

সিরাজ সিকদার ছাড়াও আরেকজন ছিলেন সরকারের ত্রাস। তিনি হলেন, লে. কর্ণেল জিয়াউদ্দিন। এনায়েতউল্লাহ খানের হলিডে পত্রিকায় তিনি ১৯৭২ সালের আগস্টে সরকারের ব্যাপক সমালোচনা করে একটি লেখা লিখেছিলেন। একজন কর্মরত সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা হয়েও লেখাটি তিনি নিজের নামেই লিখেছিলেন। সেই লেখার সবচেয়ে কঠোর লাইনটি ছিল, 'শেখ মুজিবকে ছাড়াই আমরা যুদ্ধ করেছি এবং যুদ্ধে জয়ী হয়েছি।' এরপরেও জিয়াউদ্দিনকে তেমন কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়নি। বরং তিনিই চাকরি ছেড়ে

দিয়ে যোগ দিয়েছিলেন সিরাজ সিকদারের দলে। দলে তাঁর নাম ছিল হাসান। এই জিয়াউদ্দিন সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর পর দলে কর্তৃত্ব বজায় রাখতে দলের মধ্যেই ব্যাপক খুনোখুনি করেছিলেন। পরে এরশাদের সময় প্রকাশ্য রাজনীতির ঘোষণা দেওয়ার পর তাকে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বানানো হয়। সে আরেক ইতিহাস।

সিরাজ সিকদারের উত্থানের পেছনে সে সময়ে রক্ষী বাহিনীর অত্যাচার বড় ভূমিকা পালন করেছিল। রক্ষী বাহিনীর অত্যাচারের কারণে অনেকেই সর্বহারার সমর্থক হয়েছিলেন। গবেষকরা দেখিয়েছেন, সে সব এলাকায় রক্ষী বা অন্যান্য সরকারি বা কারো কারো ব্যক্তিগত বাহিনীর অত্যাচার বেশি ছিল, সেসব সব স্থানেই সর্বহারা দলের বিকাশ দ্রুত হয়েছে। যেমন, মুন্সিগঞ্জে শাহ মোয়াজ্জেমের এক বিশাল ব্যক্তিগত বাহিনী ছিল, তারা মুন্সিগঞ্জে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করায় এখানে সর্বহারা দলের শক্তিও যথেষ্ট বেড়েছিল। সরকার সে সময় সিরাজ সিকদারকে নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ বিব্রত ছিল।

১৯৭৩ সালের নভেম্বরে ছাত্র ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন,

> *'যারা রাতের বেলায় গোপনে রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, সাধারণ মানুষকে হত্যা করে তাদের সঙ্গে ডাকাতদের কোন পার্থক্য নেই। রাতের অন্ধকারে গোপন হত্যা করে বিপ্লব করা যায় না। তোমরা যে পথ ও দর্শন বেছে নিয়েছ তা ভুল। আমরা গণতন্ত্র দিয়েছি ঠিক। কিন্তু কেউ যদি রাতের বেলায় নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করতে পারে, তাহলে জনগনের সরকার হিসাবে আমাদেরও তাদের গুলি করে হত্যা করার অধিকার আছে।'*

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সে সময়ে ব্যাপক সমালোচিত হয়েছিল। বলা হয়েছিল এটি আসলে গুলি করে হত্যার আদেশ।

জানা যায়, সিরাজ সিকদারকে ধরার জন্য আর্মিকে বলা হলেও তারা খুব আগ্রহ দেখায়নি। বরং আমরা জেনেছি যে, একবার সেনাবাহিনী সিরাজ সিকদারকে ধরলেও ছেড়ে দিয়েছিল। তবে সিরাজ সিকদারের প্রতি পুলিশ বা রক্ষী বাহিনীর তেমন কোনো সহানুভূতি ছিল না। কারণ, সর্বহারা দলের অন্যতম টার্গেট ছিল এরাও। ফলে শেষ পর্যন্ত ধরা পরতেই হয় সিরাজ সিকদারকে।

১৯৭৫ সালের প্রথম দিনটি ছিল সর্বহারা পার্টির জন্য বিষাদের একটি দিন। ওই দিনই ধরা পরেন সিরাজ সিরকদার। কিভাবে ধরা পড়েছিলেন তিনি। গল্পকারের দৃষ্টিতে সেই কাহিনী এরকম:

> *শহরে, গ্রামে নানা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারকে আগে থেকেই প্রবল চাপের মুখে রেখেছেন সিরাজ শিকদার। জরুরী অবস্থা ঘোষণা করবার পর তার তৎপরতা আরো বাড়িয়ে দেন সিরাজ শিকদার। '৭৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে হরতাল ডাকে সর্বহারা পার্টি। বোমা ফাটিয়ে, লিফলেট বিলি করে আতঙ্ক তৈরি করে তারা। দেশের নানা এলাকায় তাদের ডাকে হরতাল সফলও হয়। রক্ষীবাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন খুঁজছে সিরাজ শিকদারকে। সরকারের মোস্ট ওয়ান্টেড মানুষ তিনি। কিন্তু তার নাগাল পাওয়া দুষ্কর। কঠোর গোপনীয়তায়, নানা ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ান। নিরাপত্তার জন্য এমনকি নিজের দলের ভেতর কারো আচরণ সন্দেহজনক মনে হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন।*
>
> *১৬ ডিসেম্বর হরতাল সফল হওয়ার পর আরও ব্যাপক কর্মসূচী নেবার পরিকল্পনা নিয়ে সিরাজ*

শিকদার তখন তার পার্টি নেতৃবৃন্দের সাথে লাগাতার মিটিং করছেন চট্টগ্রামে। একেক দিন থাকছেন একেক গোপন আস্তানায়। ১৯৭৫ সালের প্রথম দিন, ১ জানুয়ারি চট্টগ্রামে হালিশহরের কাছে এক গোপন শেল্টার থেকে একজন পার্টি কর্মীসহ সিরাজ শিকদার যাচ্ছিলেন আরেকটি শেল্টারে। বেবিট্যাক্সি নিয়েছেন একটি। সিরাজ শিকদার পড়েছেন একটি দামী ঘিয়া প্যান্ট এবং টেট্রনের সাদা ফুল শার্ট, চোখে সান গ্লাস, হাতে ব্রিফকেস। যেন তুখোড় ব্যবসায়ী একজন। বেবি ট্যাক্সিতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একজন অপরিচিত লোক এসে তার কাছে লিফট চায়, বলে তার স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ, ডাক্তার ডাকা প্রয়োজন, সে সামনেই নেমে যাবে। শিকদার বেশ কয়েকবার আপত্তি করলেও লোকটির অনুনয় বিনয়ের জন্য তাকে বেবিট্যাক্সিতে তুলে নেন। চট্টগ্রাম নিউমার্কেটের কাছে আসতেই অপরিচিত লোকটি হঠাৎ লাফ দিয়ে বেবিট্যাক্সি থেকে নেমে ড্রাইভারকে পিস্তল ধরে থামতে বলে। কাছেই সাদা পোশাকে বেশ কয়েকজন অপেক্ষমান পুলিশ স্টেনগান উঁচিয়ে ঘিরে ফেলে বেবিট্যাক্সি। স্বাধীন বাংলাদেশের দুর্ধর্ষ বিপ্লবী, যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও তার দলের সদস্যেরই বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়ে যান পুলিশের হাতে।

সিরাজ শিকদারকে হাতকড়া পড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ডাবল মুরিং থানায়। সেদিন সন্ধ্যায় একটি বিশেষ ফকার বিমানে তাকে নিয়ে আসা হয় ঢাকা। তাকে রাখা হয় মালিবাগের স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে। সরকারের ত্রাস, বহুল আলোচিত, রহস্যময় এই মানুষটিকে এক নজর দেখবার জন্য সেনাবাহিনীর সদস্য, আমলাদের মধ্যে ভিড় জমে যায়।

৩ জানুয়ারি সারা দেশের মানুষ পত্রিকায় পড়ে, 'বন্দি অবস্থায় পালানোর সময় পুলিশের হাতে নিহত হন পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি নামে পরিচিত একটি গুপ্ত চরমপন্থী দলের প্রধান সিরাজুল হক শিকদার ওরফে সিরাজ শিকদার'। ছাপানো হয় সিরাজ শিকদারের মৃতদেহের ছবি।

ধরা পরার পরের দিন সরকার একটি প্রেসনোট জারি করে। সেখানে বলা হয়,

'পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি নামে পরিচিত আÍ গোপনকারী চরমপন্থী দলের নেতা সিরাজুল হক সিকদার ওরফে সিরাজ সিকদারকে পুলিশ গত ১ জানুয়ারি চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার করে। সেই দিনই তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি স্বীকোরোক্তমূলক বিবৃতি দেন এবং তার দলীয় কর্মীদের কিছু গোপন আস্তানা এবং তাদের বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবার''দ দেখিয়ে দেয়ার জন্য পুলিশের সঙ্গে যেতেও সম্মত হন। তদনুযায়ী গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে একদল পুলিশ যখন তাকে পুলিশ ভ্যানে করে গোপন আস্তানার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন তিনি সাভারের কাছে পুলিশ ভ্যান থেকে লাফিয়ে পড়েন এবং পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। পুলিশ তার পলায়ন রোধের জন্য গুলীবর্ষণ করে। ফলে সিরাজ সিকদারের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।'

আগ্রহী পাঠকরা নিশ্চই লক্ষ্য করেছেন, সরকারি এই প্রেসনোটের বক্তব্য ও ভাষার সঙ্গে গত কয়েক বছর ধরে ক্রসফায়ারের পর র‌্যাব ও পুলিশ যে প্রেসনোট দেয়, তার সঙ্গে অনেক মিল আছে। বস্তুত, দেশের প্রথম ক্রসফায়ারের শিকার সিরাজ সিকদার।

৩ তারিখের পত্রিকায় সরকারি তথ্যের বরাত দিয়ে আরও কিছু কথা ছাপা হয়েছিল:

'

সিরাজ সিকদার তার গোপন দলে একদল ডাকাতের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। এদের দ্বারাই তিনি গুপ্তহত্যা, থানা, বনবিভাগীয় দফতর, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ইত্যাদির উপর হামলা, ব্যাংকলুট, হাট বাজার, লঞ্চ, ট্রেন ডাকাতি, রেল লাইন উপড়ে ফেলে গুরুতর ট্রেন দুর্ঘটনা সংঘটন এবং জনসাধারণের কাছ থেকে জবরদস্তি টাকা আদায়-এই ধরণের উচ্ছৃঙ্খল অপরাধেল মাধ্যমে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলাকে বিঘ্নিত করেছিলেন।'

মজার ব্যাপার হল, বলা হয় সিরাজ সিকদারের বুকে গুলি ছিল। অথচ পালিয়ে যাওয়ার সময় গুলি লাগার কথা পেছনে। এ বিষয়ে মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অব) তাঁর বইতে লিখেছেন,

'ঢাকা ক্লাবে অনুষ্ঠানে পুলিশের তৎকালীন একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে সিরাজ সিকদার প্রসঙ্গে কথা বললে তিনি হঠাৎ বলে বসেন, 'কর্ণেল সাহেব, আমাদের এবং আপনাদের যুদ্ধের মধ্যে তফাত এটাই।'

অর্থাৎ পেছন থেকে গুলি করার কথা একপ্রকার স্বীকার করে নিয়েছিলেন ওই পুলিশ কর্মকর্তাটি।
সাভারে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক আগে, এখন যেখানে রেডিওর অফিস, সেখানেই গুলি করা হয়েছিল সিরাজ সিকদারকে।

'বাংলাদেশ: আ লিগেসি অব ব্লাড' গ্রন্থে অ্যান্থনী মাসকেরেনহাস লিখেছেন:

ঘটনাচক্রে মাওপন্থী সিরাজ সিকদার ১৯৭৪ সালে ডিসেম্বরের শেষ দিকে চট্টগ্রামের কাছাকাছি এক এলাকা থেকে (টেকনাফ) শেষ পর্যন্ত পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হলেন।
জাকারিয়া চৌধুরির (সিরাজ সিকদারের ছোটবোন, ভাস্কর শামীম সিকদারের স্বামী) মতে, তাকে পাহারা দিয়ে ঢাকায় আনা হলো শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করানো জন্য। শেখ মুজিব তাকে তার আয়ত্বে আনতে চাইলেন। কিন্তু সিকদার কোনো রকম আপোষ রফায় রাজী না হলে মুজিব পুলিশকে 'প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা' গ্রহণ করতে বলে দিলেন।
জাকারিয়া বললো, সিরাজ সিকদারকে হাতকড়া লাগিয়ে চোখ-বাঁধা অবস্থায় রমনা রেস কোর্সের পুলিশ কন্ট্রোল রুমে নিয়ে আসা হয়। তারপর (২ জানুয়ারি ১৯৭৫) গভীর রাতে এক নির্জন রাস্তায় নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই সময় সরকারি প্রেসনোটে বলা হয় যে, পালানোর চেষ্টাকালে সিরাজ সিকদারকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।
সিকদারের বোন, জাকারিয়ার স্ত্রী শামীম জানায়, সিরাজের দেহের গুলির চিহ্ন পরিস্কার প্রমাণ করে যে, স্টেনগান দিয়ে তার বুকে ছয়টি গুলি করে তাকে মারা হয়েছিলো।
সিরাজ সিকদারকে, শেখ মুজিবের নির্দেশেই হত্যা করা হয়েছে বলে সারাদেশে রটে গেলো।
১৯ বছরের যুবতী শামীম তার ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো।
সে আমাকে বলেছিলো, আমি সর্বহারা পার্টির কাছ থেকে একটা রিভলবার পেয়েছিলাম এবং এই হত্যাকারীকে হত্যা করার সুযোগের সন্ধান করছিলাম।
শামীম বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের একজন। গত বছরই কেবল সে তার ভাস্কর্যের প্রেসিডেন্ট পুরস্কার লাভ করে। তার ধারণা, সে নিশ্চয়ই মুজিবকে গুলি করার দূরত্বে পেয়ে যাবে।

শামীম মুজিবের সঙ্গে দেখা করার জন্য বহুবার আর্জি পেশ করেছে। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। প্রতিবারই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে সে। তারপর সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের কলা বিভাগে তার এক প্রদর্শনীতে শেখ মুজিবকে আমন্ত্রণ জানালো। মুজিব আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সেখানে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলেন।
সে স্মৃতিচারণ করে বললো, আমি ভায়নক বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলাম। আমি শত চেষ্টা করেও তাঁকে (শেখ মুজিব) আমার গুলির আয়ত্বে আনতে পারলাম না।
ভাগ্যই মুজিবকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলো। শামীম জাকারিয়ার প্রেমে পড়ে যায়। শেষে তাদের বিয়ে হলে স্বামীর সঙ্গে শামীম বিদেশে চলে যায়।

সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর পর ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংসদ অধিবেশন বসে। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী পাস করানোর পর তার দ্বিতীয় বিপ্লব, বাকশাল প্রসঙ্গে শেখ মুজিব অধিবেশনে বলেন,

' স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ার পর যারা এর বিরোধীতা করেছে, যারা শত্রুর দালালী করেছে, কোনো দেশেই তাদের ক্ষমা করা হয় নাই। কিন্তু আমরা করেছি। আমরা তাদের ক্ষমা করে দিয়ে বলেছি, দেশকে ভালোবাসো। দেশের স্বাধীনতা মেনে নাও। দেশের কাজ করো। কিন্তু তারপরও এদের অনেকে শোধরায়নি। এরা এমনকি বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে বিদেশ থেকে টাকা নিচ্ছে। ওরা ভেবেছে, আমি ওদের কথা জানি না! একজন রাতের আঁধারে মানুষ মেরে যাচ্ছে, আর ভাবছে তাকে কেউ ধরতে পারবে না। কোথায় আজ সিরাজ সিকদার? তাকে যখন ধরা গেছে, তখন তার সহযোগীরাও ধরা পড়বে।'

বলে রাখা ভাল, চট্টগ্রাম থেকে সিরাজ সিকদারকে ধরা হয়েছিল তাঁর একজন সহযোগিসহ। তাঁর নাম ছিল আকবর। ধরা পরার একমাস পরে এই আকবরের লাশ পাওয়া গিয়েছিল বরিশালে, তারই নিজের বাড়ির সামনে।

হয়তো কাকতালীয়। তাও উল্লেখ করা যায়। ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে সর্বহারা পার্টি পুরোপুরি এক ব্যক্তি নির্ভর হয়ে পড়ে। ওই সময়ে দলে এক সদস্যের একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। এই একমাত্র সদস্য হলেন সিরাজ সিকদার। এই একক নেতৃত্ব নিয়েই দলের মধ্যে গ্রুপিং ও ষড়যন্ত্র শুরু হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ধরা পড়েন তিনি এবং নির্মমভাবে নিহত হন। তাকে হত্যার নির্দেশ দেওয়ার জন্য দায়ী করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে। তিনিও নিহত হয়েছিলেন বাকশাল গঠনের পর। এই বাকশালও ছিল এক ব্যক্তি নির্ভর।
সিরাজ সিকদারের হত্যা নিয়ে একটি মামলা হয়েছিল ১৯৯২ সালে। সিরাজ সিকদার পরিষদের সভাপতি শেখ মাহিউদ্দিন আহমদ মামলাটি করেছিলেন।

মামলার আসামিরা হলেন : ১. সাবেক পুলিশ সুপার মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, ২. আবদুর রাজ্জাক এমপি, ৩. তোফায়েল আহমেদ এমপি, ৪. সাবেক আইজিপি ই এ চৌধুরী, ৫. সাবেক রক্ষীবাহিনীর মহাপরিচালক কর্নেল (অব.) নূরুজ্জামান, ৭. মোহাম্মদ নাসিম এমপি গং। আসামিদের বিরুদ্ধে ৩০২ ও ১০৯ নম্বর ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।
আর্জিতে বলা হয়:

আসামিরা মরহুম শেখ মুজিবের সহচর ও অধীনস্থ কর্মী থেকে শেখ মুজিবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও গোপন শলা-পরামর্শে অংশগ্রহণ করতেন এবং ১ নং থেকে ৬ নং আসামি তৎকালীন সময়ে সরকারের উচ্চপদে থেকে অন্য ঘনিষ্ঠ সহচরদের সঙ্গে শেখ মুজিবের সিরাজ সিকদার হত্যার নীলনকশায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা এ লক্ষ্যে সর্বহারা পার্টির বিভিন্ন কর্মীকে হত্যা, গুম, গ্রেপ্তার, নির্যাতন ও হয়রানি করতে থাকেন। সিরাজ সিকদারকে গ্রেপ্তার ও হত্যার বিবরণ দিয়ে আর্জিতে বলা হয়, মরহুম শেখ মুজিব ও উল্লিখিত আসামিরা তাঁদের অন্য সহযোগীদের সাহচর্যে সর্বহারা পার্টির মধ্যে সরকারের চর নিয়োগ করেন। এদের মধ্যে ই এ চৌধুরীর একজন নিকটাত্মীয়কেও চর হিসেবে নিয়োগ করা হয়। এভাবে ১৯৭৫ সালের ১ জানুয়ারি চট্টগ্রামের নিউমার্কেট এলাকা থেকে অন্য একজনসহ সিরাজ সিকদারকে গ্রেপ্তার করে ওই দিনই বিমানে করে ঢাকায় আনা হয়। ঢাকার পুরনো বিমানবন্দরে নামিয়ে বিশেষ গাড়িতে করে বন্দিদের পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের মালিবাগস্থ অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সিরাজ সিকদারকে আলাদা করে তাঁর ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। ২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর বিশেষ স্কোয়াডের অনুগত সদস্যরা গণভবনে মরহুম শেখ মুজিবের কাছে সিরাজ সিকদারকে হাত ও চোখ বাঁধা অবস্থায় নিয়ে যায়। সেখানে শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মরহুম ক্যাপ্টেন (অব.) মনসুর আলীসহ আসামিরা, শেখ মুজিবের পুত্র মরহুম শেখ কামাল এবং ভাগ্নে মরহুম শেখ মনি উপস্থিত ছিলেন। আর্জিতে আরো বলা হয়, প্রথম দর্শনেই শেখ মুজিব সিরাজ সিকদারকে গালিগালাজ শুরু করেন। সিরাজ এর প্রতিবাদ করলে শেখ মুজিবসহ উপস্থিত সবাই তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। সিরাজ সে অবস্থায়ও শেখ মুজিবের পুত্র কর্তৃক সাধিত ব্যাংক ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপকর্ম, ভারতীয় সেবাদাসত্ব না করার, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য শেখ মুজিবের কাছে দাবি জানালে শেখ মুজিব আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। সে সময় ১ নং আসামি মাহবুব উদ্দিন তাঁর রিভলবারের বাঁট দিয়ে মাথায় আঘাত করলে সিরাজ সিকদার মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। শেখ কামাল রাগের মাথায় গুলি করলে সিরাজ সিকদারের হাতে লাগে। ওই সময় সব আসামি শেখ মুজিবের উপস্থিতিতেই তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কিল, ঘুষি, লাথি মারতে মারতে তাঁকে অজ্ঞান করে ফেলেন। এর পর শেখ মুজিব, মনসুর আলী এবং ২ থেকে ৭ নং আসামি সিরাজ সিকদারকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ১ নং আসামিকে নির্দেশ দেন। ১ নং আসামি মাহবুব উদ্দিন আহমদ আসামিদের সঙ্গে বন্দি সিরাজ সিকদারকে শেরে বাংলানগর রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তরে নিয়ে যান। এর পর তাঁর ওপর আরো নির্যাতন চালানো হয়। অবশেষে ২ জানুয়ারি আসামিদের উপস্থিতিতে রাত ১১টার দিকে রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তরেই সিরাজ সিকদারকে গুলি করে হত্যা করা হয়। পরে ১ নং আসামির সঙ্গে বিশেষ স্কোয়াডের সদস্যরা পূর্বপরিকল্পনা মতো বন্দি অবস্থায় নিহত সিরাজ সিকদারের লাশ সাভারের তালবাগ এলাকা হয়ে সাভার থানায় নিয়ে যায় এবং সাভার থানা পুলিশ পরের দিন ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে প্রেরণ করে।

সিরাজ সিকদারের হত্যা নিয়ে ১৯৭৮ সালের ১৯ মে সংখ্যার বিচিত্রায় একটি অনুসন্ধানি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল। সেটির কথা অনেকের লেখায় আছে। কিন্তু প্রতিবেদনটি পাওয়া যায়নি। কারো কাছে থাকলে হয়তো

আরও কিছু জানা যেত।
প্রশ্ন হচ্ছে, কেন ধরা পড়লেন সিরাজ সিকদার? সন্দেহ নেই নিজের দলের লোকেরাই ধরিয়ে দিয়েছিল সিরাজ সিকদারকে। এর আগে অনেক চেষ্টা করেও ধরা যায়নি সিরাজ সিকদারকে।
হালিম দাদ খান লিখেছেন,

'চুয়াত্তরের শেষার্ধে মুজিব সেনাবাহিনীকে নক্সালদের মূলোৎপাটনের নির্দেশ দেন। কিন্তু মেজর ফারুক এ নির্দেশ পালনে উৎসাহী না হয়ে বরং এদের কাউকে ধরতে পারলেও ছেড়ে দিয়েই অধিক আনন্দ পেতেন।'

কেবল সেনাবাহিনীই নয়, আওয়ামী লীগের মধ্যেও কিছু সিরাজ সিকদারের সমর্থক ছিলেন। এ ক্ষেত্রে চমকে যাওয়ার মতো একটি তথ্য দিতে পারি। ফজলুল হক রানা ছিলেন সর্বহারা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদেও ছিলেন। তিনি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন সেনাবাহিনীর মধ্যে তাদের যোগাযোগ ছিল। অনেক তরুণ অফিসারদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল। তবে পার্টির পহেলা কাতারের সহানুভূতিশীল হিসাবে তিনি নাম বলেছেন বিশেষ একজন ব্যক্তির। সেই ব্যক্তিটি হলেন আবদুর রব সেরনিয়াবাত। তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রধান নেতা, বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ট এবং আত্মীয় (বোনের স্বামী)।
ফজলুল হক রানা বলেছেন,

'আবদুর রব সেরনিয়াবাত ছিলেন মনে-প্রাণে ভারতবিদ্বেষী। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে ভারত ৭ দফা গোলামি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করলে তখন থেকেই সেরনিয়াবাদ ভারতের বির''দ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ....আর এভাবেই জনাব সেরনিয়াবাত আমাদের পার্টির একজন গুরুত্বপূর্ণ সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন এবং নানাভাবে আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করেন।'

রানা সবশেষে বলেছেন, সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর পর এই যোগাযোগগুলো নষ্ট হয়ে যায়। সেনাবাহিনীর সাথেও। সেনাবাহিনীর অনেক অফিসারদের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল দলের।
সর্বহারা পার্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা রইসউদ্দিন আরিফসহ দুজনকে নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল দল থেকেই। আসুন দেখা যাক, তিনি কি বলেছেন:

'সে সময়কার সিলেট অঞ্চলের পরিচালক পার্টির তৎকালীন নেতৃস্থানীয় ক্যাডার কমরেড মনসুর নানা কারণে পার্টি নেতৃত্বের ওপর বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এ ক্ষোভকে কেন্দ্র করে পার্টির ভিতরে সংগ্রাম পরিচালনার উদ্দেশ্যে মনসুর কিছু প্রস্তাব এবং পরিকল্পনা প্রনয়ন করেন। তার এ প্রস্তাব ও পরিকল্পনার বিষয়টি অবহিত করার জন্য তিনি তৎকালীন চট্টগ্রাম অঞ্চলের পরিচালক কমরেড ইকরামকে একটি চিঠি পাঠান। কিন্তু ইকরামকে লেখা এ চিঠিখানি ভুলবশত অন্য একটি প্যাকেটে পার্টির নেতার হাতে চলে যায়। ফলে মনসুর বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যান। এই বিব্রতকর অবস্থার একপর্যায়ে মনসুর দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সিলেট থেকে অতিদ্রুত চট্টগ্রামে আসেন। চট্টগ্রাম এসেই নাটকীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নেন কমরেড সিরাজ সিকদারকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয়ার। জানা যায়, একপর্যায়ে কমরেড সিকদারের বৈঠকের স্থান ও যাতায়তের পথের বিবরণ দিয়ে ছোট্ট

একখানা চিরকুট লিখে ডবলমুরিং থানায় পাঠান। সেই চিরকুটের সূত্র ধরেই পুলিশ কমরেড সিরাজ সিকদারকে গ্রেফতার করে।'

এবার আমরা ফিরে যেতে পারি পুরোনো কিছু কথায়। দলের মধ্যে শুদ্ধি অভিযান শুরু করেছিলেন সিরাজ সিকদার নিজেই। দলে কেউ বিদ্রোহ করলে তাকে বহিস্কার বা অন্য কোনো পথ অবলম্বন না করে খতম করার ধারাটি শুরু করেছিলেন সিরাজ সিকদার নিজেই। ফজলু-সুলতান গ্রুপকে খতম করার মধ্য দিয়ে সেই অধ্যায় শুরু হয়েছিল। আবার স্মরণ করতে পারি রইসউদ্দিনের আরিফের সেই কথাগুলো।

'পার্টিতে বাহাত্তর সালে ফজলু খতম হয়েছিল আকস্মিকভাবে। পার্টির স্থানীয় কর্মী ও গেরিলারা কেন্দ্রের অনুমোদন ছাড়াই ফজলুকে খতম করেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটি পরে ফজলু খতমের বিষয়টিকে অনুমোদন করে এবং এহেন কাজকে অভিনন্দিত করে। অথচ আমার মতে সে সময়ে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সঠিক করণীয়টি ছিল একদিকে ফজলু-সুলতান চক্রের পার্টিবিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রাম জোরদার করা এবং একই সাথে ফজলু খতমের ঘটনাকে নিন্দা করা। পার্টি যদি সেদিন এই ঐতিহাসিক দায়িত্বটি পালনে সক্ষম হতো, তাহলে সর্বহারা পার্টির ইতিহাস লিখিত হতো ভিন্নভাবে।'

চট্টগ্রামের মনসুর জানতেন দলে বিদ্রোহ বা বিক্ষুব্ধ হওয়ার একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদন্ড। ফলে যখন সে জানলো তার চিঠিটি অন্যহাতে পড়েছে তখন তার জন্য আর কোনো বিকল্প ছিল না। নিজে বাঁচার জন্যই যে মনসুর সিরাজ সিকদারকে ধরিয়ে দিয়েছিল তা দলের ভেতর থেকেই স্বীকার করা হয়। ফলে পুরানো কথাটাই আবার বলি, ফজলু-সুলতান গ্রুপকে খতম করা না হলে হয়তো সর্বহারা পার্টির ইতিহাস অন্যরকম হতো, হয়তো বেঁচে থাকতেন সিরাজ সিকদার। হয়তো বেচে থাকতেন কবি হুমায়ুন কবিরসহ আরও অনেকেই।

কথা আরেকটু আছে। মনসুর একাই কি সিরাজ সিকদারকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। না কি দলের আর কেউ ছিলেন। সন্দেহ করার মতো অনেক আলামত কিন্তু আছে। যেমন, সিরাজ সিকদার ধরা পড়েন ১ জানুয়ারি, ১৯৭৫ দুপুর ২টায়। আর সরকারি ভাবে তাঁর মৃত্যুর কথা জানানো হয় পরের দিন রাতে। এই সময়ের মধ্যে সর্বহারা দলের কোনো তৎপরতাই ছিল না। দলের মূল নেতা ধরা পড়েছেন জেনেও সেই তথ্য দলের মধ্যে জানানো হয়নি। নেওয়া হয়নি কোনো পদক্ষেপ। অথচ যে কোনো ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখানোর ক্ষমতা দলটির ছিল। এ ক্ষেত্রে স্মরণ করি, কর্ণেল তাহের ধরা পরার পর জাসদ কর্তৃক ভারতের হাই কমিশনার সমর সেনকে জিম্মি করার চেষ্টার কথা। কেউ কেউ বলেন, পুলিশের সঙ্গে একটা সমঝোতা হয়েছিল দলের কারো কারো সঙ্গে। পুলিশকে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে না জানানো পর্যন্ত দলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানানো হবে না।

পার্টির চট্টগ্রাম অংশের এসব ভূমিকার কারণে দলের মধ্যে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ হয় পরে। চট্টগ্রামের নেতাদের খতম করা হয়েছিল ব্যাপকভাবে। অনেক নিরীহ পার্টিকর্মীও খতম হন। তাদের অপরাধ ছিল সিরাজ সিকদার ধরা পড়েছিলেন চট্টগ্রামে। সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলেছিল অনেকদিন। এমনকি মনসুরকেও কিছুদিনের মধ্যেই খতম করা হয়েছিল।

লেখাটা শুরু করেছিলাম সিরাজ সিকদারের প্রথম বিয়ে ও বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে। এর পরের পর্ব ছিল জাহানারা হাকিমের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক, একসঙ্গে থাকা ও বিয়ে নিয়ে। আগেই বলেছি সিরাজ সিকদারের বিবাহ

বিচ্ছেদ ও আবার বিয়ে করার ফল পার্টির জন্য মোটেই ভাল হয়নি। এর একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। সেই প্রভাবটি সবশেষে বলি। পুরো লেখার শেষ টুইস্ট।

> *'পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছিল, সিরাজ সিকদারের ঐদিনের মিটিং ও পথ-নির্দেশিকা তারা পায় পুলিশের কাছে মেয়েলি হাতের লেখা একটি চিঠির মাধ্যমে। ধারণা করা হয়, এই মহিলাটি সিরাজ সিকদারের স্ত্রীও হতে পারেন। দলের ভেতরে তখন তার কর্মকাণ্ড নিয়ে বিতর্ক ও সমালোচনা ছিল।'*

সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর পর জাহানারা হাকিমের আর কোনো তৎপরতা দলে ছিল না।

বলেছিলাম শেষ পর্বে সব রেফারেন্স দেবো। ফেসবুকে কেউ কেউ রেফারেন্সগুলো জানতে চেয়েছেন।

১. এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য: স্বাধীনতার প্রথম দশক, মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অব) বীরবিক্রম, মাওলা ব্রাদার্স
২. কথামালার রাজনীতি ১৯৭২-৭৯, রেজোয়ান সিদ্দিকী, প্রতীক
৩. বাংলাদেশের রাজনীতি, ১৯৭২-৭৫, হালিম দাদ খান, আগামী প্রকাশনী
৪. কুসুমিত ইস্পাত, হুমায়ুন কবির, বইপড়ুয়া
৫. বাংলাদেশে বামপন্থী রাজনীতির গতিধারা, ১৯৪৮-৮৯, জগলুল আলম, প্রতীক
৬. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী মুক্তিযোদ্ধারা, মেহেরুন্নেসা মেরী, ন্যাশনাল পাবলিকেশন্স
৭. বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিকথা, অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ-রাজনীতি হত্যা-ধর্ম সাম্প্রদায়িকতা, রইসউদ্দিন আরিফ, পাঠক সমাবেশ
৮. আন্ডারগ্রাউন্ড জীবন সমগ্র: বাংলাদেশ ও উপমহাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিতর্কিত অধ্যায়, রইসউদ্দিন আরিফ, পাঠক সমাবেশ
৯. বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, আশরাফ কায়সার, মাওলা ব্রাদার্স
১০. সিরাজ সিকদার রচনা সমগ্র, শ্রাবণ প্রকাশনী
১১. বাংলাদেশ ১৯৭১, তৃতীয় খন্ড, মাওলা ব্রাদার্স
১২. সিরাজ সিকদার: ভুল বিপ্লবের বাঁশীওয়ালা, অমি রহমান পিয়ালের ব্লগপোস্ট, সামওয়ারইন ব্লগ ও আমার ব্লগ
১২. সিরাজ সিকদার: অন্য আলোয় দেখা, বিপ্লব রহমানের ব্লগপোস্ট, উন্মোচন
১৩. সিরাজ সিকদার ও তাঁর সর্বহারা পার্টি, কালের কণ্ঠ, আরিফুজ্জামান তুহিনের একাধিক লেখা
১৪. কথ্য ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র
১৫. ভালবাসার সাম্পান, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, মাওলা ব্রাদার্স
১৬. নৃশংসতায় দুই কবি-শিক্ষক, জাফর ওয়াজেদ, নতুন দেশ
১৭. ক্রাচের কর্ণেল, শাহাদুজ্জামান, মাওলা ব্রাদার্স
১৮. আহমদ ছফার ডায়েরি, সম্পাদনা-নুরুল আনোয়ার, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি
১৯. রুহুল ও রাহেলা, সূর্য রোকন (এটি অনলাইনে পাওয়া যায়)
২০. গণতন্ত্রের বিপন্ন ধারায় বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, মেজর নাসির উদ্দিন, আগামি প্রকাশনী